আমি তপু

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

কোন কিছু বোঝায় আগেই তপুর জীবনটা হঠাৎ করে পাল্টে গেলো চিরদিনের মতোই। দেখতে দেখতে তার আপনজনেরা দূরে সরে যেতে থাকে, এক সময় তপু আবিষ্কার করে সে একা। একবারেই একা।

নিঃসঙ্গ কিশোরের এই দুঃসহ জীবনে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল তার বিচিত্র সব সঙ্গী সাথী। তাদের নিয়ে সে কী পাড়ি দিতে পারবে তার বান্ধবহীন নিষ্ঠুর এই জীবন?

'আমি তপু' নিঃসঙ্গ এক কিশোরের বেঁচে থাকার ইতিহাস। নিষ্ঠুরতার ইতিহাস এবং ভালবাসার ইতিহাস।

একা একা

আমার নাম তপু। ভাল নাম আরিফুল ইসলাম। আমি বি.কে. সরকারি হাই স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি। আমাদের ক্লাসে এখন আটচল্লিশজন ছেলে-মেয়ে, তার মাঝে আমার রোল নম্বর পঁয়তাল্লিশ। আমি বেশি লম্বা-চওড়া না, মোটামুটি ছোটখাটো সাইজ। আমার বয়স তেরো কিন্তু নিজের কাছে মনে হয় আমার বয়স বুঝি চল্লিশের কাছাকাছি। আমি জানি কেউ আমরা কথা শুনলে একটুও বিশ্বাস করবে না, বলবে, ক্লাস এইটে পড়ে একটা ছেলের কাছে খামোখা নিজের বয়স চল্লিশ মনে হবে কেন? কিন্তু কথাটা সত্যি - আমি একটুও বাড়িয়ে বলি নাই। আমার আব্বু যখন গাড়ি একসিডেন্টে মারা গেলেন তখন আমার বয়স ছিল দশ, আমি তখন পড়ি ক্লাস ফাইভে। তারপর তিন বৎসর পার হয়েছে, এই তিন বৎসরে আমি তিন ক্লাস ওপরে উঠেছি। কিন্তু আব্বু মারা যাবার পর প্রত্যেকটা বৎসর আমার কাছে মনে হয়েছে দশ বৎসরের মতো লম্বা - একজন মানুষের দশ বৎসরে যে অভিজ্ঞতা হবার কথা আমার এক বৎসরেই সেই অভিজ্ঞতা হওয়া শুরু করল। তাই আমার সব সময় মনে হয় গত তিন বৎসরে আমার বয়স বেড়েছে তিরিশ বৎসর। সেই জন্যে বলছিলাম সব সময় আমার মনে হয় আমার বয়স প্রায় চল্লিশ। একজন চল্লিশ বছর বয়সের মানুষ যেভাবে চিন্তা করে আমিও মনে হয় সেইভাবে চিন্তা করি - অনেকটা বুড়ো মানুষের মতো। আমি যখন আসলেই বুড়ো হব তখন কী হবে কে জানে, তবে আমার মনে হয় সত্যি সত্যি বুড়ো হবার অনেক আগেই আমি মরে যাব।

কেন আমি এতো তাড়াতাড়ি বুড়ো মানুষের মতো হয়ে গেছি সেটা খুব বেশি মানুষ জানে না। যারা আমাকে বাইরে থেকে দেখে তাদের ধারণা আমার আব্বু মারা যাবার পর আমি বখে গিয়েছি। সেটা তারা ভাবতেই পারে, আমি তাদের একটুও দোষ দিই না। আগে আমি পড়াশোনায় অসম্ভব ভাল ছিলাম, শুধু যে পরীক্ষায় ফার্স্ট হতাম তাই না, যে সেকেন্ড হতো সে কখনো আমার ধারে-কাছে আসতে পারত না। এখন আমার পরীক্ষায় পাস করা নিয়েই ঝামেলা-

আটচল্লিশজন ছেলেমেয়ের মাঝে কোনমতে টেনেটুনে আমি হয়েছি পঁয়তাল্লিশ নম্বর। আমার ধারণা সামনের বছর আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরও হতে পারব না, ক্লাস এইটেই আটকা পড়ে যাব। অঙ্ক ছাড়া আর কোন বিষয়ে আমি পাস করতে পারব না। আমি যে শুধু পড়াশোনাতে খারাপ হয়েছি তা না, আমার আচার-ব্যবহার স্বভাব-চরিত্র সবকিছু খারাপ হয়ে গেছে। আমি কারো সাথে ভাল করে কথা বলি না, খুব সহজে অন্যদের গালাগালি করতে পারি— ভয়ংকর ভয়ংকর খারাপ গালি আমি শিখে গেছি। শুধু যে গালাগালি করতে পারি তা না, মারামারিও করতে পারি। আমার গায়ে যে খুব জোর তা না– কিন্তু মারামারি করার জন্যে আসলে বেশি গায়ের জোর দরকার হয় না, যেটার দরকার সেটা হচ্ছে সাহস। সেটা আজকাল আমার ভালই হয়েছে— বড় ক্লাসের ছেলেদেরকেও আমি মাঝে মাঝে ধামকি-ধুমকি দিয়ে ফেলি। আমাদের ক্লাসের ভাল ছেলেরা আমার কাছেই আসে না, আর মেয়েদের কথা তো ছেড়েই দিলাম— আমি যদি কখনো তাদের চোখের দিকে তাকাই তাহলেই তারা মনে হয় ভয়ের চোটে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে।

আমি নোংরা কাপড় পরে স্কুলে আসি, চুল থাকে উষ্কখুষ্ক চেহারার মাঝে সবসময় একটা হতচ্ছাড়া ভাব থাকে, আমাকে দেখে আজকাল কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে আমি এক সময় স্কুলের নিখুঁত একটা ভাল ছেলে ছিলাম। কবিতা আবৃত্তি করতাম, ডিবেট করতাম, এমনকী স্কুলের বার্ষিক নাটকে আমি ছোট রাজপুত্রের অভিনয় করে একবার রুপার মেডেল পর্যন্ত পেয়েছিলাম। আমার বড় আপু কিংবা ভাইয়া এখনো নিখুঁত ভালো মেয়ে আর নিখুঁত ভালো ছেলে শুধু আমি অন্য রকম। আমার বড় আপুর নাম ঈশিতা, এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। শাড়ি পরে আপু যখন ইউনিভার্সিটিতে যায় তখন পাড়ার ইউনিভার্সিটি-কলেজে যাওয়া ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আর লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমার ভাইয়ার নাম রাজীব, সে যখন কলেজ থেকে এসে একটা টি শার্ট পরে ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে খেলতে বের হয় তখন কম বয়সী মেয়েরা চোখের কোণা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে নিজেরা একজন আরেকজনের সাথে ফিসফিস করে কথা বলে খিলখিল করে হাসে। শুধু আমি অন্য রকম— আমার দিকে কেউ ঘুরে তাকায় না। যারা আমাদের ভাল করে চিনে না তাদের ধারণা আমার আম্মুর দুই ছেলে-মেয়ে, আপু আর ভাইয়া। আমি তাদের খুব দূর সম্পর্কের কোন গরিব হতভাগা আত্মীয়ের বখে যাওয়া ছেলে আর তারা দয়া করে আমাকে তাদের বাসায় থাকতে দিয়েছে। প্রথম প্রথম পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আপু আর ভাইয়া খুব অস্বস্তি বোধ করত, আজকাল করে না। অনেক দিন

হলো মেনে নিয়েছে— ধরেই নিয়েছে তারা হলো আমার আম্মুর সত্যিকারের ছেলে-মেয়ে আর আমি তাদের আপন ভাই হয়েও বাইরের একজন মানুষ।

এর শুরুটা ছিল খুব কষ্টের। আব্বু মারা যাবার পর প্রথম ধাক্কাটা সামলে নেবার পর আমরা প্রথম যেদিন খেতে বসেছি তখন সবাই দেখেছি আম্মু কিছু খেতে পারছেন না। প্লেটের খাবার হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। সেটা দেখে আমাদেরও চোখে পানি এসে গেলো, আব্বু যেই চেয়ারটায় খেতে বসতেন সেই চেয়ারটা আছে কিন্তু আব্বু নাই ব্যাপারটা চিন্তা করেই আমার বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। আমিও নিজেকে সামলাতে না পেরে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। আম্মু তখন আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "তপু তুই কাঁদছিস কেন?"

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "আব্বুর কথা মনে পড়ছে আম্মু।"

আম্মুর চোখগুলো হঠাৎ কেমন যেন জ্বলে উঠল, কঠিন মুখে বললেন, "খবরদার, ঢং করবি না।"

আম্মুর কথা শুনে আমি এতো অবাক হলাম যে এক মুহূর্তের জন্যে কাঁদতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম, আমি অবাক হয়ে আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আম্মু চিৎকার করে বললেন, "বাপকে মেরে এসে এখানে বসে ঢং করিস? জানোয়ারের বাচ্চা।"

আম্মুকে দেখে হঠাৎ করে আমার কেমন যেন ভয় লাগতে থাকে, মনে হতে থাকে আমি তাকে চিনি না। আমি ছিলাম সবচেয়ে ছোট ছেলে, আব্বু আম্মু আপু ভাইয়া সবাই সবসময় আমার সাথে শুধু আহ্লাদি করেছে, আদর করেছে; ধমক দেয়া দূরে থাকুক কেউ কখনো গলা উঁচিয়ে কথা পর্যন্ত বলেনি! অথচ আম্মু এখন আমাকে জানোয়ারের বাচ্চা বলে গালি দিচ্ছে? বলছে আমি আমার আব্বুকে মেরে এসেছি?

খাবার টেবিলে আপু ভাইয়া আর আমি আম্মুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আপু বলল, "কী বলছ আম্মু?"

আম্মু চিৎকার করে বললেন, "ভুল বলেছি আমি? তোদের আব্বু কী এই বদমাইশটার জন্যে ক্রিকেট ব্যাট কিনতে গিয়ে মারা যায় নাই? ক্রিকেট ব্যাটের জন্যে কী ঘ্যান ঘ্যান করে এই জানোয়ারের বাচ্চা তোর আব্বুর জীবন নষ্ট করে দেয় নাই? যদি সেই রাতে ক্রিকেট ব্যাট কিনতে না যেত তাহলে কী মানুষটা এখন বেঁচে থাকত না?"

এটা সত্যি কথা, আমি কয়েক দিন থেকে আব্বুকে বলেছিলাম একটা ভাল দেখে ক্রিকেট ব্যাট কিনে দিতে, আব্বু সেদিন অফিস থেকে এসে আমাকে

নিয়ে গিয়েছিলেন গুলশান মার্কেটে। ব্যাট কিনে ফিরে আসার সময় উল্টোদিক থেকে একটা গাড়ি হঠাৎ করে ছুটে এসেছে তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। এরপর যখন জ্ঞান এসেছে দেখেছি আমি একটা ভাঙ্গা গাড়ির নিচে চাপা পড়ে থাকা একটা মানুষকে ধরে চিৎকার করছি। মানুষটা আমার আব্বু, কিন্তু রক্তে মাখামাখি হয়ে তাকে আর চেনা যায় না। আব্বু যদি সেদিন আমাকে নিয়ে ব্যাট কিনতে না যেতেন তাহলে সত্যিই হয়তো আব্বু বেঁচে থাকতেন।

আপু হাত দিয়ে আম্মুকে ধরে বলল, "কী বলছ আম্মু? তপুর কী দোষ? এইটা একটা একসিডেন্ট!"

"একসিডেন্ট?" আম্মু টেবিলে হাত দিয়ে থাবা দিয়ে বললেন, "তাহলে এই শয়তানের বাচ্চার কিছু হলো না কেন? তার গায়ে একটা আঁচড় লাগল না আর তার বাপ স্পট ডেড— এটা কীরকম একসিডেন্ট?"

আমি বিস্ফারিত চোখে আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইলাম আর মনে হতে লাগলো কেন আমি আব্বুর সাথে তখন তখনি মরে গেলাম না! আম্মু আমার দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে থেকে চিৎকার করে বললেন, "শয়তানের বাচ্চা, দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে। দূর হয়ে যা এই মুহূর্তে, না হলে আমি তোকে খুন করে ফেলব!"

তারপর কিছু বোঝার আগে আম্মু আমার দিকে পানির গ্লাসটা ছুড়ে মারলেন, আমি মাথাটা সরানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু লাভ হল না। কাচের গ্লাসটা আমার কপালে এসে লাগলো। আমি ব্যথা পেলাম কীনা বুঝতে পারলাম না, ভয়ংকর একটা আতংক নিয়ে আমি আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আপু ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে নিয়ে গেলো, আমি তখনো থরথর করে কাঁপছি। আপু আমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে, বলছে, "সব ঠিক হয়ে যাবে তপু। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আমি ভাঙ্গা গলায় বললাম, "আপু, আম্মু এরকম করছে কেন?"

"খুব বড় শক পেয়েছে তো।"

"আমার ভয় লাগছে আপু, অনেক ভয় লাগছে।"

"ভয়ের কিছু নাই। সব ঠিক হয়ে যাবে তপু। দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু আসলে সব ঠিক হয়ে যায় নি। প্রথম রাত আমি সারারাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেঁদেছি, আমার মনে হয়েছে হয়তো রাত্রিবেলা আম্মু আমার কাছে আসবেন। আগের মতো আমাকে বুকে চেপে ধরে বলবেন, "তপু সোনা

আমার। রাগ করিস না আমার ওপর বাবা, মাথার ঠিক নেই, কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলেছি।" কিন্তু আম্মু রাত্রিবেলা আমার কাছে এলেন না। শুধু যে সেই রাত্রে এলেন না তা না, কোন রাত্রিতেই এলেন না। আমি সারাক্ষণই অপেক্ষা করে থাকতাম যে কখন আম্মু আমার সাথে একটু নরম স্বরে কথা বলবেন, কখন এসে একটু আদর করবেন। কিন্তু আম্মু আদর করা বা নরম সুরে কথা বলা দূরে থাকুক আমার দিকে ভাল করে তাকালেনই না। শেষে আর কোন উপায় না দেখে একদিন গভীর রাতে আমি নিজেই আম্মুর কাছে গিয়েছি। আম্মু ঘুমাচ্ছিলেন, আমি আস্তে আস্তে ডাকলাম, "আম্মু।"

আম্মু ঘোরের মাঝে অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "কে?"

"আমি তপু।"

তখন আম্মু চোখ খুলে তাকালেন, বারান্দার আলো ঘরে এসে পড়েছে। সেই আলোতে আম্মু আমাকে দেখলেন। আমি মশারি তুলে আম্মুকে ধরার চেষ্টা করলাম, আম্মু কেমন যেন ছিটকে সরে গেলেন, তীব্র স্বরে বললেন, "কী হয়েছে?"

আমি আর পারলাম না, ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললাম, বললাম, "তুমি কেন আর আমাকে আদর করো না?"

আম্মু কেমন যেন হিংস্র গলায় বললেন, "আদর করব? আমি? তোকে? কেন তোকে আদর করব? তুই কে? নিজের বাপকে খুন করে তুই এখন আমার কাছে এসেছিস?"

আমার মনে হতে লাগলো সমস্ত দুনিয়াটা আমার চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে, তবু আমি শেষবার চেষ্টা করলাম, বললাম, "আম্মু! আমি তো কিছু করি নাই! আব্বু তো একসিডেন্টে মারা গেছেন।"

"তুই কেন একসিডেন্টে মারা গেলি না?"

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "তুমি চাও আমিও একসিডেন্টে মারা যাই?"

আম্মু চাপা গলায় বললেন, "হ্যাঁ। আমি চাই। তুই আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা। আর কোন দিন তুই আমার সামনে আসবি না!"

"কোন দিন আসব না?"

"না।"

বারান্দা থেকে আসা আবছা আলোতে আমি কিছুক্ষণ আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইলাম, হঠাৎ করে আমার মনে হলো আমার বয়স বুঝি অনেক বেড়ে গেছে। মনে হলো আমি আর ছোট বাচ্চা নই, মনে হলো আমি অনেক বড় একজন

মানুষ। আমি বুঝতে পারলাম এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, আমি একেবারে একা। আমি যদি বেঁচে থাকতে চাই আমার একা বেঁচে থাকতে হবে, যদি বড় হতে চাই তাহলে একা বড় হতে হবে। আমার চোখের পানি হঠাৎ করে শুকিয়ে গেল, আমি বুঝতে পারলাম যার চোখের পানির কোন মূল্য নেই এই পৃথিবীতে তার থেকে হতভাগা আর কেউ নেই। আমি আর একটি কথা না বলে নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

আমি সারারাত জানালার রড ধরে বসে ছিলাম। আব্বু মারা যাবার পর আমার বুকটা একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল, কিন্তু এখন আমার বুকের ভেতর যে কষ্ট জমা হয়েছে সেটা কখনো কাউকে বলে বুঝাতে পারব না। নিজের ভেতর গভীর একটা অভিমান হলো, আম্মুর ওপর অভিমান, পৃথিবীর ওপর অভিমান, এমনকী আমাদেরকে ছেড়ে এতো তাড়াতাড়ি মরে যাবার জন্যে আব্বুর ওপর অভিমান। আমি রাতের বেলা জানালার রড ধরে বসে থাকতে থাকতে ঠিক করলাম আমি আত্মহত্যা করব।

আমি অবশ্যি আত্মহত্যা করতে পারি নি। আত্মহত্যা করার জন্যে মনে হয় অনেক সাহসের দরকার, দশ বছরের ছোট একটা ছেলের আসলে এত সাহস থাকে না। আমি আত্মহত্যা করার জন্যে অনেক দিন ওভার ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে থাকতাম, একটা বাস বা ট্রাক যাবার সময় আমি মনে মনে ঠিক করতাম যে এখন আমি লাফিয়ে পড়ব কিন্তু কখনোই শেষ পর্যন্ত লাফিয়ে পড়তে পারি নি। আত্মহত্যা না করলেও আত্মহত্যা করে যখন ইচ্ছা তখন সবকিছু শেষ করে দিতে পারব– এই চিন্তাটা আমার ভেতরে খানিকটা ভরসা এনে দিল আর এই ভরসাটার কারণেই আমি একদিন একদিন করে বেঁচে থাকতে লাগলাম।

আস্তে আস্তে বাসায় আমার অবস্থাটা আরো খারাপ হয়ে গেলো। আম্মু এমনিতে ভাল মানুষ, আব্বুর অফিসে তাকে বেশ ভাল একটা চাকরি দিয়েছে। অফিসের গাড়ি এসে আম্মুকে নিয়ে যায় আবার বিকেলে আম্মুকে বাসায় ফিরিয়ে দিয়ে যায়। আম্মু সারাদিন স্বাভাবিকভাবে অফিস করেন, কেউ কিছু বুঝতে পারে না। বাসাতে এসেও হাসিখুশি থাকেন কিন্তু আমাকে দেখলেই হঠাৎ করে খেপে যান, কেউ তাকে থামাতে পারে না। কোন উপায় না দেখে আপু আর ভাইয়া মিলে আমাকে আম্মুর চোখের সামনে থেকে আড়াল করে রাখতে শুরু করল। খাবার টেবিলেও আমি যাই না। আম্মু আপু আর ভাইয়াকে নিয়ে খান– আমি খাই আলাদা। আগে নিয়ম ছিল সন্ধে হবার আগে সবাইকে বাসায় ফিরে আসতে হবে এখন সেই নিয়মটা শুধু আপু আর ভাইয়ার জন্যে, আমি বাসায়

এসেছি কী আসি নি কেউ সেটা জানতে চায় না। একদিন আম্মুর নতুন অফিস থেকে একজন আমাদের বাসায় বেড়াতে এলো, আম্মু তাকে বললেন তার দুইজন ছেলে-মেয়ে; তারপর ভাইয়া আর আপুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কেউ কেউ মনে করতে পারে আমি যে আছি সেটা আম্মু ভুলে গেছেন। কিন্তু সেটা সত্যি নয়, আম্মু আসলে সেটা একবারও ভুলতে পারেন না। যখন আস্তে আস্তে নিয়ম হয়ে গেলো আম্মু আপু আর ভাইয়াকে নিয়ে খাবে আর আমি খাব আলাদা তখন আমার খাবারটাও অন্যরকম হয়ে গেল। আম্মু খাওয়া শেষ করে দুলি খালাকে দিয়ে সব খাবার ফ্রিজে তুলে রাখতেন যেন আমি সেটা খেতে না পারি। দুলি খালা আমার জন্যে সেখান, থকে খাবার গরম করতে চাইলে আম্মু রেগে আগুন হয়ে যেতেন– দুলি খালা এতোদিন থেকে আমাদের বাসায় আছেন, তাকে পর্যন্ত আম্মু একেবারে অকথ্য ভাষায় গালাগাল শুরু করতেন।

আস্তে আস্তে আমি দুলি খালার সাথে রান্নাঘরে বসে খেতে শুরু করলাম। মোটা চালের ভাত, কোন একটা ভর্তা, বাসি ডাল এই ধরনের খাবার। দুলি খালা কখনো লুকিয়ে একটা ডিম ভাজা করে দিতো, রান্না করার সময় হয়তো আমার জন্যে একটু খাবার লুকিয়ে রাখতো– কখনো সেগুলো দিতো। আমি যখন খেতাম তখন দুলি খালা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তো আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। আমি যে সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করে ফেলি নি দুলি খালা তার একটা কারণ। আপু আর ভাইয়া আমার জন্যে যেটা করতে পারে নি দুলি খালা সেটা করেছিল, সে আমাকে বেঁচে থাকার জন্যে সাহস দিয়েছিল। আমি যখন খেতাম তখন আমার পাশে বসে ফিসফিস করে বলতো, "শোন বাবা তপু। তোমার ওপরে কিন্তু খুব বড় বিপদ। তোমার মা তোমারে আদর করে না সেইটা সত্যি না। সন্তান হইল মায়ের শরীলের অংশ। সন্তান চোর ডাকাইত বদমাইশ যাই হোক মা তারে ভালবাসে। যদি কখনো কুনো মা তার সন্তানরে ভাল না বাসে তাইহলে তার অর্থ কী জানো?"

আমি জিজ্ঞেস করতাম, "কী?"

দুলি খালা গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলতো, "তার অর্থ তার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তোমার মা অসুস্থ। তোমার মা পাগলি। তোমার বাপ মরে যাবার পর তার মাথাটা পুরাপুরি আউলে গেছে। অন্য কেউ বুঝতে পারে না, আমি পারি। চোখ দেখলেই বুঝতে পারি।"

"কেন? চোখে কী হয়েছে?"

"চোখগুলি জ্বলে তুমি দেখ নাই? তুমি খুব সাবধান বাবা– আমার কেন জানি মনে হয় কোন একদিন তোমার মা তোমারে খুন করে ফেলার চেষ্টা করবে।"

শুনে আমার শরীর কেঁপে উঠলো। দুলি খালা তখন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলতো, "তোমার বাপ মরে যাবার পর তোমাদের এই সংসারটা ছারখার হয়ে গেছে। এইখানে আমার মন টিকে না বাবা। একেবারে ভাল লাগে না। তবু আমি এইখানে আছি– কেন আছি জানো?

"কেন দুলি খালা?"

"তোমার জন্যে। খালি তোমার জন্যে। তোমার ভাই আর বইন তোমারে রক্ষা করতে পারবে না। আমি না থাকলে তুমি না খায়া মারা যাইবা। বুঝেছ?"

আমি মাথা নাড়ি। দুলি খালা বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তোমার মায়ের উপর কুনো রাগ রাইখ না বাবা। তোমার মা আসলে পুরাপুরি পাগল। সে কী করতাছে সে জানে না। তারে আসলে পাগলাগারদে রাখা দরকার। তার চিকিৎসা হওনের দরকার। তারে তাবিজ-কবজ দেওয়া দরকার–"

দুলি খালাই আসলে সত্যিকার ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিল, আস্তে আস্তে আমি নিজেই বুঝতে পেরেছিলাম আব্বু মারা যাবার পর সত্যি সত্যি আমার আম্মুর মাথার ভিতরে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। তার চিকিৎসা করানোর দরকার ছিল, কিন্তু আমাকে সহ্য করতে না পারা ছাড়া আর কোন সমস্যা ছিল না দেখে সেটা বাইরের কেউ কোন দিন বুঝতে পারে নি। দুলি খালা বলেছিল আম্মু আমাকে খুন করে ফেলতে পারে, আমি সেটা কখনো বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু সত্যি সত্যি একদিন একেবারে অকারণে রেগে উঠে আম্মু আমার মাথা বালতির পানিতে চেপে ধরেছিলেন। দুলি খালা রীতিমতো ধস্তাধস্তি করে আমাকে ছুটিয়ে না আনলে হয়তো সেদিন মরেই যেতাম। সেই থেকে আমি খুব সাবধান হয়ে গেছি। আম্মু যদি বাসায় একা থাকেন আমি বাসার ভিতরেই ঢুকি না। যতদিন আব্বু বেঁচে ছিলেন গায়ে হাত তোলা দূরে থাকুক কেউ আমার সাথে গলা উঁচু করেও কথা বলে নি। এখন সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, একেবারে অকারণে আম্মু আমাকে মারধর করেন। ছোটখাটো চড়-থাপ্পড় নয় একেবারে অমানুষিক মার। প্রথম প্রথম আপু, ভাইয়া কিংবা দুলি খালা আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতো কিন্তু তাহলে আম্মু আরো রেগে যান বলে আজকাল আর কেউ চেষ্টা করে না। আমি দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করতে শিখে গেছি। মার খাওয়ার যন্ত্রণাটুকু নয় এর পিছনের নিষ্ঠুরতাটুকু আমাকে অনেক বেশি কষ্ট দেয়।

কয়দিনের ভিতরেই আমি রান্নাঘরে স্টোররুমে ঘুমানো শুরু করলাম। আমার পরিচিত মানুষেরা এটা শুনলে নিশ্চয়ই খুব অবাক হতো কিন্তু ততদিনে আমার বাসার সবাই এটা মেনে নিয়েছে। আমি যদি আগের মতো ভাইয়ার ঘরে

ঘুমাই তাহলে প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই আম্মুর কোন একরকম অত্যাচার সহ্য করতে হয়। আম্মু এমনিতে ভাল মানুষ শুধু আমাকে দেখলেই খেপে যান। তাই সমস্যাটার সবচেয়ে ভাল সমাধান হচ্ছে যেন কোন সময়েই আমাকে দেখতে না পান। বাসায় এসে আমি তাই রান্নাঘরের স্টোররুমে ঢুকে যেতাম। চালের বস্তা, আলুর টুকরি, তেল-পেঁয়াজ সরিয়ে দুলি খালা আমাকে শোয়ার একটা জায়গা করে দিল। আমি রাত্রেবেলা সেখানে ঘুমাতাম। বাসার সবাই বিষয়টা জানতো কিন্তু এমন ভান করতো যেন জানে না। আপু আর ভাইয়া যখন আমার দিকে তাকাতো আমি বুঝতে পারতাম আমার জন্যে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু কিছু করতে পারছে না। আমি আস্তে আস্তে আবিষ্কার করলাম এক সময়ে তারাও পুরো ব্যাপারটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেলো, ধরেই নিল আমি রান্নাঘরের স্টোররুমে চালের বস্তার পাশে আলু বেগুন পেঁয়াজ আর রসুনের পাশে গুটিশুটি মেরে ঘুমাব। আগে পড়াশোনার একটা ব্যাপার ছিল এখন সেটাও নাই, খাতা কলম বইপত্র না থাকলে মানুষ পড়াশোনা করে কেমন করে? ধীরে ধীরে পড়াশোনাটাও প্রায় বন্ধ হতে শুরু করল। স্কুলের ছেলেমেয়েরা আর স্যার-ম্যাডামেরা ধরে নিলো আব্বু মারা যাবার পর আমি আস্তে আস্তে বখে যেতে শুরু করেছি। আমার শরীরে আম্মুর মারের যেসব চিহ্ন থাকতো সবাই ধরে নিতে শুরু করল সেগুলো এসেছে মারামারি করে! আস্তে আস্তে সবাই আমাকে ভয় পেতে শুরু করলো। আমার দুই চারজন যে বন্ধুবান্ধব ছিল তারাও আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে শুরু করল।

আমি হয়ে গেলাম একা। একেবারে একা।

প্রিয়াংকা

এরকম সময়ে আমি ঠিক করলাম আমি বাসা থেকে পালিয়ে যাব। আগেই করা উচিত ছিল, কেন করি নাই সেটা ভেবেই আমার অবাক লাগল। আত্মহত্যা করার বিষয়টা অনেকবার চিন্তা করেছি কিন্তু বাসা থেকে পালানোর কথা একেবারেই চিন্তা করি নাই। আত্মহত্যা করার সাহস হয় নাই কিন্তু বাসা থেকে পালানোর বিষয়টা আমার কাছে খুব সহজ মনে হতে লাগলো। রান্নাঘরের স্টোররুমে তেলাপোকা আর ইঁদুরের মাঝখানে আমি যদি ঘুমাতে পারি তাহলে রাস্তাঘাটে-ফুটপাথে কিংবা রেল স্টেশনে ঘুমাতে অসুবিধা হবে কেন? আমি কল্পনা করতে শুরু করলাম সবাইকে ছেড়েছুড়ে বহুদূরে কোথাও চলে গেছি— কোন পাহাড়ের কাছে কিংবা সমুদ্রের তীরে। একা একা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কেউ আমাকে কিছু বলছে না, ঘেন্না করছে না, বকাবকি করছে না, মারধর করছে না। বহুদিন আগে যখন আমি টেলিভিশন দেখতে পারতাম তখন টেলিভিশনে একবার বেদেদের ওপরে একটা অনুষ্ঠান দেখেছিলাম, তারা সবাই মিলে নৌকায় নৌকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। নৌকায় তাদের ঘরবাড়ি, নৌকায় তাদের সংসার, নৌকায় তাদের সবকিছু। খুঁজে খুঁজে এরকম বেদে নৌকা খুঁজে বের করে তাদের সাথে চলে যাব। আমিও বেদে হয়ে যাব।

বাসা থেকে পালিয়ে যাবার শুধু একটা সমস্যা- সেটা খুব ভাবনাচিন্তা করে করা যায় না। কাজেই আমি ঠিক করলাম কোন একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসা থেকে বের হয়ে যাব আর ফিরে আসব না। আমি মোটামুটি নিশ্চিত আমি বাসায় ফিরে আসি নাই বাসার কেউ সেটা অনেক দিন জানবে না। হয়তো দুলি খালা সেটা প্রথমে লক্ষ্য করবে, বাসায় বলার চেষ্টা করবে কিন্তু আম্মু শুনতে চাইবেন না। আম্মু যেহেতু শুনতে চাইবেন না তাই আপু আর ভাইয়াও কিছু করতে পারবে না, নিজেরা নিজেরা হয়তো এখানে সেখানে একটু খোঁজখবর নেবে তারপর হাল ছেড়ে দেবে। কয়দিন পরে আস্তে আস্তে সবাই ভুলে যাবে। আগে হলে এই পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে আমার ভয়ংকর একটা অভিমান হতো, আকজাল কিছুই হয় না। মানুষের ভেতর ভাল ভাল যেসব অনুভূতিগুলি

থাকে আমার সেগুলি শুকিয়ে শেষ হয়ে গেছে। নিজের ভিতরে সেগুলি শেষ হয়ে গেছে বলে অন্যের ভেতরে সেগুলো থাকতে পারে সেটাও আমার আর বিশ্বাস হয় না। যাকেই দেখি তাকেই মনে হয় নিষ্ঠুর।

যেদিন বাসা থেকে পালাব ঠিক করলাম সেদিন একটু সকাল সকাল বের হয়েছি, সরাসরি রেল স্টেশনে গিয়ে কোন একটা ট্রেনের ছাদে গিয়ে বসব ঠিক করেছিলাম কিন্তু খানিক দূর গিয়ে মনে হলো শেষবারের মতো একবার স্কুল থেকে ঘুরে আসি। কেন সেটা মনে হলো কে জানে! একজন মানুষের জীবনে একটা ছোট ঘটনা সবকিছু ওলটপালট করে দেয়– আমার সেদিনের স্কুলে যাবার ঘটনাটা ছিল সেরকম একটা ঘটনা, আমার জীবনের সবকিছু সেই ঘটনার জন্যে অন্যরকম হয়ে গেল।

ক্লাসরুমে জানালার কাছাকাছি একটা সিট আমার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা আছে, সেখানে কেউ বসতে সাহস পায় না। আমাদের ক্লাসের ছেলেরা আর মেয়েরা একে অন্যের সাথে মিশে না, মেয়েরা সামনে কয়েকটা বেঞ্চে বসে, ছেলেরা বসে পিছনে। ছেলেরা পিছনে বসলেও শুধু যে আমার সিটে কেউ বসে না তা নয়, আমার পাশেও বসতে চায় না। কিন্তু সেদিন ক্লাসে গিয়ে দেখি আমার সিটে একজন বসে আছে। কোন একজন ডানপিটে ধরনের বা গাধা টাইপের ছেলে হলে কথা ছিল– যে বসে আছে সে একটা মেয়ে। নতুন এসেছে বলে কিছু জানে না। আমাদের ক্লাসের মেয়েগুলো অহংকারী ধরনের, কখনো হাসে না, সবসময় মুখ গম্ভীর করে থাকে। দেখলেই মনে হয় কেউ বুঝি তাদের আচ্ছা করে বকাবকি করেছে কিংবা ধরে জোর করে তেতো কোন ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে, সেই জন্যে মুখগুলো এরকম ভোঁতা! তবে এই মেয়েটা তাদের মতো না, সম্পূর্ণ অন্যরকম। মেয়েটার চোখে-মুখে হাসি, চোখগুলো কেমন যেন চকচক করছে। পিছনের ডেস্কে হেলান দিয়ে বসে এমনভাবে পা দুলাচ্ছে যে দেখে মনে হবে তার বুঝি খুব আনন্দ হচ্ছে। মেয়েটার আহ্লাদি ভাব দেখেই আমার মেজাজ একটু গরম হয়ে গেলো। আমি কাছাকাছি গিয়ে বললাম, "সরো।"

মেয়েটা পা দোলানো বন্ধ করে বলল, "কোথায় সরব?"

আমি মেঘের মতো গলায় বললাম, "মেয়েরা সামনে বসে। ছেলেদের সাথে বসে না।"

মেয়েটার হাসি হাসি মুখ এবারে একটু গম্ভীর হলো। বলল, "ছেলেদের সাথে বসলে কী হয়?"

আমি এখন তার সাথে একটা আলোচনা শুরু করে দেব সেটা তো হতে পারে না, তাই মুখ খিঁচিয়ে একটা ধমক দিয়ে বললাম, "খবরদার বলছি, ভ্যাদর ভ্যাদর করবে না। তোমাকে সরতে বলেছি সরো।"

ক্লাসের অন্য যে কোন মেয়ে হলে আমার এই ধমক খেয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলতো, কিন্তু এই মেয়ের কিছু হলো না। আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি খুব একটা মজার কথা বলেছি। তার মুখে হাসি হাসি ভাবটা ফিরে এলো এবং আবার সে পা দোলাতে শুরু করল। আমি আবার হুংকার দিলাম, "কী হলো কথা কানে যায় না?"

আমার ধমক শুনে ক্লাসের অন্য সবাই ঘুরে তাকিয়েছে, সোজাসুজি তাকাতে সাহস পাচ্ছে না তাই চোখের কোণা দিয়ে আমাকে দেখার চেষ্টা করছে। আমার মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেলো, আমি আবার মুখ-চোখ খিঁচিয়ে হাত নেড়ে হুংকার দিয়ে বললাম, "এটা আমার সিট, এখান থেকে সরো।"

আমি যখন এভাবে মুখ-চোখ খিঁচিয়ে হুংকার দিয়ে কথা বলি তখন কেউ আমার দিকে তাকাতেই সাহস পায় না কিন্তু এই মেয়ে একেবারে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, চোখে ভয়-ডর তো নেই-ই উল্টো মনে হলো কৌতুক। যেন আমি হাসির একটা নাটক করছি আর সে সেই নাটকটা খুব উপভোগ করছে। আমি টেবিলে থাবা দিয়ে আরেকটা ধমক দিতে যাচ্ছিলাম তখন মেয়েটা বলল, "ঠিক আছে, আমি তোমাকে তোমার সিটে বসতে দেব কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ?"

"তুমি এরকম রাগ হয়ে কথা বলতে পারবে না। তোমাকে সুইট করে কথা বলতে হবে!"

আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম। মেয়েটার নিশ্চয়ই পুরোপুরি মাথা খারাপ তা না হলে কেউ এভাবে কথা বলে? মেয়েটা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলো, "তুমি বলো, 'প্লি-ই-জ তুমি এখান থেকে সরে বসো', তাহলে আমি তোমাকে তোমার সিট ছেড়ে দেব।"

মেয়েটার কথার মাঝে কী ছিল কে জানে, আমাদের চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের অনেকেই হি হি করে হেসে উঠল। আমাকে নিয়ে কেউ হাসলে আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না, আমার মাথায় একেবারে রক্ত চড়ে গেল। আমি তখন ডেস্কের ওপর রাখা মেয়েটার খাতা বই ব্যাগ টান দিয়ে ছুড়ে নিচে ফেলে দিয়ে বললাম, "আমার সাথে ঢং করো? ঢং করো আমার সাথে?"

মেয়েটা এবারে একটু অবাক হয়ে তাকালো, মাথা নেড়ে বলল, "আমি আজকে প্রথম দিন তোমাদের স্কুলে এসেছি আর তুমি আমার সাথে এরকম ব্যবহার করলে?" মেয়েটা নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু অপেক্ষা করে বলল, "আমি মনে খুব কষ্ট পেলাম।"

মানুষ যে সুন্দর করে বা ভাল করে কথা বলতে পারে আমি সেটা ভুলেই গেছি। আমার সাথে কেউ ভাল ব্যবহার করে না, আমিও করলাম না। বললাম, "মেয়ে বলে বেঁচে গেলে। ছেলে হলে এমন ছ্যাঁচা দিতাম যে তখন খালি মনে না শরীরের গিটটুতে গিটটুতেও কষ্ট পেতে!"

মেয়েটা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল আমি তাকে সেই সুযোগ না দিয়ে ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে এলাম। বের হওয়ার সময় লক্ষ্য করলাম ক্লাসের বেশ কয়েকটা ছেলেমেয়ে মেয়েটার কাছে ছুটে গেলো, নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে খোঁজখবর দিয়ে সাবধান করে দেবে। ক্লাসে ফিরে আসার পর মেয়েটা যে আমার থেকে দূরে নিরাপদ একটা জায়গায় বসবে সে বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই। ক্লাস শুরু হতে এখনো দেরি আছে। আমি ততক্ষণ স্কুলের বাউন্ডারি ওয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে চারপাশের সবকিছু দেখে সময় কাটাই। আমার কোন বন্ধু নাই, কোন আপনজন নাই– আমি সব সময় একা একা থাকি।

ঘন্টা পড়ার পর ক্লাসে ফিরে এসে দেখলাম মেয়েটা আমার জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে একটু সরে বসেছে। কিন্তু পুরোপুরি সরে গিয়ে নিরাপদ জায়গায় বসে নি। আমাকে দেখে খুব মনোযোগ দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করল কিন্তু কিছু বলল না। আমি সরাসরি তার দিকে তাকালাম না, তাই বুঝতে পারলাম না তার চোখের দৃষ্টিতে ভয় বা ঘেন্না কোনটা আছে। ঘেন্না থাকাটাই স্বাভাবিক– আজকাল কেউ আমাকে দেখতে পারে না।

প্রথম পিরিয়ডে বাংলা। বাংলা স্যারের নাম তোফাজ্জল হোসেন সরকার ছেলেরা ডাকে তোফাজ্জল হোসেন রাজাকার— সংক্ষেপে রাজাকার স্যার। এই নামের পিছনে একটা কারণ আছে, স্যারের ধারণা মুক্তিযুদ্ধের পুরো ব্যাপারটা ভুয়া, ইন্ডিয়া যুদ্ধ করে দেশটা দখল করে ফেলেছে। ক্লাসেও সেটা আকারে ইঙ্গিতে আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। বাংলা বইয়ে বীরশ্রেষ্ঠদের গল্প পড়ার সময় স্যার ফ্যাক ফ্যাক করে হাসেন যেন পুরো বিষয়টা একটা তামাশা। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো ক্লাসে পড়ান না, কেউ সেটা নিয়ে প্রশ্ন করারও সাহস পায় না। বাংলাদেশের সাথে যখন পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা হয় তখনও এই স্যার বাংলাদেশকে সাপোর্ট না করে পাকিস্তানকে সাপোর্ট করেন।

ঘণ্টা পড়ার কিছুক্ষণ পর তোফাজ্জল হোসেন সরকার খাতাপত্র নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। ঢুকে সবসময় স্যার সারা ক্লাসে একবার চোখ বুলিয়ে নেন, আজকেও চোখ বুলালেন এবং আমার পাশে এই নতুন মেয়েটিকে বসে থাকতে দেখে কেমন যেন চমকে উঠলেন। খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তু-তুমি এখানে কেন?"

মেয়েটা বলল, "আমি নতুন এসেছি স্যার।"

মেয়েটা নতুন এসেছে, যেটুকু দেখেছি তাতে মনে হচ্ছে মাথায় একটু পাগলামোর ধাচ আছে তাই স্যারের প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারল না। স্যার আসলে জানতে চাচ্ছিলেন সে মেয়ে হয়ে ছেলেদের সাথে কেন বসেছে। স্যার রাজাকার টাইপের মানুষ, কোন ছেলে আর মেয়েকে কথা বলতে দেখলেই খুব বিরক্ত হন— ক্লাসে পাশাপাশি বসতে দেখলে তার তো মেজাজ খারাপ হতেই পারে। স্যার বললেন, "নতুন এসেছ তো বুঝতেই পারছি। তা পিছনে বসেছ কেন? সামনে আস।"

ইঙ্গিতটা একেবারে স্পষ্ট, মেয়ে হয়ে ছেলেদের সাথে পিছনে বসেছ কেন, সামনে চলে এসো। মেয়েটা ইঙ্গিতটা হয় বুঝতে পারল না কিংবা না বোঝার ভান করল, ফিক করে একটু হেসে ফেলে বলল, "না স্যার। পিছনেই ভাল। আমি সব সময় পিছনে বসি।"

স্যার বললেন, "পি-পিছনে বসে?"

"জি স্যার।"

"কেন?"

"পিছনে বসলে সবাইকে দেখা যায়। খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়।"

আমাদের রাজাকার স্যার মনে হয় কিছুই বুঝতে পারলেন না, খানিকক্ষণ মুখ হাঁ করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ঢোক গিলে বললেন, "ইন্টারেস্টিং?"

"জি স্যার।"

আস্তে আস্তে তার মুখটা মেঘের মতো কালো হলো, স্যার ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তুমি স্কুলে কী পড়াশোনা করতে এসেছ না ইন্টারেস্টিং কাজ করতে এসেছ?"

মেয়েটার চেহারায় একটা হাবা হাবা ভাব আছে কিন্তু মেয়েটা অসম্ভব চালু, স্যারের প্রশ্নের উত্তরে একটুও চিন্তা না করে সাথে সাথে বলল, "ইন্টারেস্টিং উপায়ে পড়াশোনা করতে এসেছি স্যার।"

মেয়েটার কথা শুনে ক্লাসের অনেকে খিকখিক করে হেসে ফেলল, স্যার তখন আরো রেগে গেলেন, ধমক দিয়ে বললেন, "চোপ, সবাই চোপ।"

সবাই চুপ করে যাবার পর স্যার তার রেজিস্টার খাতা খুলে গম্ভীর গলায় রোল নম্বর ডাকতে শুরু করলেন। নতুন মেয়েটার রোল নম্বর বাহান্ন, নাম প্রিয়াংকা।

রোল কল শেষ করে স্যার পড়াতে শুরু করলেন। ক্লাসের শুরুতেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তাই আজকে আমাদের কপালে দুঃখ আছে। স্যার বই দেখে একটা প্যারাগ্রাফ শেষ করেই জয়ন্তকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। জয়ন্ত ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্র, উত্তরটা ঠিকভাবে দিয়ে দিল, স্যার মনে হলো তখন আরেকটু রেগে গেলেন। আমরা ভাবলাম জয়ন্তকে আরো কঠিন একটা প্রশ্ন করবেন। জয়ন্তকে পড়াশোনার প্রশ্ন করে আটকানো খুব কঠিন, তবে রাজাকার স্যারের অসাধ্য কিছু নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত জয়ন্ত একটা ভুল উত্তর না দিচ্ছে স্যার প্রশ্ন করে যেতেই থাকবেন এবং তখন তাকে আচ্ছা মতন পেটাবেন— স্যার প্রায় সব ক্লাসেই হিন্দু ছেলেদের পেটান। কিন্তু আজকে জয়ন্তের কপাল ভাল, স্যার জয়ন্তকে ছেড়ে দিলীপকে ধরলেন। দিলীপের পড়াশোনায় একেবারে মন নেই, ক্লাসে এসে উদাস মুখে বসে থাকে। সে কী বুদ্ধিমান না বোকা সেটা আমরা এখনও ঠিকভাবে ধরতে পারি নাই। স্যারেরা কিছু জিজ্ঞেস করলে প্রশ্ন শেষ হবার আগেই মাথা নেড়ে বলে, "জানি না স্যার।"

আজকেও তাই হলো, সাথে সাথে রাজাকার স্যার এসে খপ করে দিলীপের চুলের মুঠি ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে এনে পেটাতে শুরু করলেন। স্যারের মনে কোন দয়ামায়া নেই, একেবারে পশুর মতো পেটাতে পারেন আজকে মনে হয় রাগটা আরেকটু বেশি, ধরেই যেভাবে মারতে শুরু করলেন তার কোন তুলনা নেই।

ঠিক তখন একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল, যার জন্যে রাজাকার স্যার দূরে থাকুক আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। আমার পাশে বসে থাকা মেয়েটা তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে, "না স্যার, না স্যার" বলে চিৎকার করতে করতে ক্লাসের সামনে ছুটে গেল। স্যার কিছু বোঝার আগেই সে দিলীপকে ধরে স্যারের হাত থেকে ছুটিয়ে নেয়। দিলীপের সামনে দাঁড়িয়ে সে মাথা নেড়ে বলে, "না স্যার, প্লিজ। আপনি মারবেন না।"

স্যারের কয়েক সেকেন্ড লাগল বুঝতে কী হচ্ছে, যখন বুঝতে পারলেন তখন একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে স্যারের মুখ রাগে বিকৃত

হয়ে গেলো, কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর চিৎকার করে বললেন, "সরে যাও আমার সামনে থেকে বেয়াদব মেয়ে।"

এতো বড় ধমক খেয়েও মেয়েটার এতটুকু ভাবান্তর হলো না, বরং মনে হলো তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। মুখটা হাসি হাসি রেখেই অনুনয়ের গলায় বলল, "না স্যার। প্লিজ। আমি স্যার এই ক্লাসে নতুন এসেছি– ক্লাসের সবাই আমার বন্ধু। একজন বন্ধুর সামনে আরেকজন বন্ধুকে মারলে তার খুব লজ্জা হয় স্যার। প্লিজ স্যার– লজ্জা দেবেন না স্যার।"

"লজ্জা? লজ্জা হয়?" স্যার দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, "আমার সাথে তুই মশকরা করিস? এইখানে কারো ভিতরে কোন লজ্জা-শরম আছে? যতো সব বেহায়া-বেয়াদব বেজন্মার দল–"

রাজাকার স্যারের এতো বড় হুংকারের মাঝেও মেয়েটা ঘাবড়ালো না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, "না স্যার, লজ্জা আছে। আমাদের সবার ভেতরে লজ্জা আছে। আমাদের মারলে ব্যথাটা সহ্য করতে পারি, কিন্তু স্যার লজ্জাটা সহ্য করতে পারি না–"

আমি এইবারে নড়েচড়ে মেয়েটার দিকে তাকালাম। সত্যিই তো, আমার আম্মু যখন আমাকে নির্দয়ভাবে মারেন একটু পরেই আর ব্যথার অনুভূতিটা থাকে না। তখন শুধু থাকে লজ্জা আর অপমান। এই মেয়েটা তো সত্যি কথাই বলছে। আমরা ছোট হতে পারি তাই বলে আমাদের মান-অপমান নেই, লজ্জা নেই— সেটা তো সত্যি নয়। এই প্রথমবার পাগলাটে ধরনের নতুন মেয়েটাকে আমি একটু গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করলাম। হালকা-পাতলা শ্যামলা একটা মেয়ে। ছোট ছোট করে চুল কেটেছে, অনেকটা প্রায় ছেলেদের মতো, চোখে-মুখে এক ধরনের তীব্র অনুভূতির ছাপ, দেখে মনে হচ্ছে দিলীপকে রাজাকার স্যারের হাত থেকে রক্ষা করাটাই বুঝি তার জীবনের সবকিছু। যাকে রক্ষা করার জন্যে মেয়েটা এতো বড় একটা বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে সেই দিলীপকে কিন্তু মোটেও বিচলিত দেখা গেলো না। সে মোটামুটি উদাস উদাস মুখে পুরো ব্যাপারটা নির্লিপ্তভাবে দেখছে, দেখে মনে হচ্ছে এখানে কী হচ্ছে তাতে তার কিছু আসে যায় না।

রাজাকার স্যার কেমন যেন বিস্ফারিত চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কেউ যদি স্যারকে না চিনে তাহলে তার কাছে স্যারের চেহারাটা মনে হয় ভালই মনে হবে কিন্তু আমরা তাকে একেবারে দুই চোখে দেখতে পারি না বলে কখনোই তার চেহারাটাকে ভাল মনে হয় নি। এখন রেগে যাবার পর তার

চেহারাটাকে আরো খারাপ মনে হতে থাকে– তাকে ঠিক মানুষ নয় একটা খ্যাপা কুকুরের মতো দেখাতে থাকে। স্যারের সব রাগ মনে হয় এইবার মেয়েটার ওপরে এসে পড়ল। তার চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল, নাকের গর্তগুলো বড় হয়ে গেল, মুখ থেকে দাঁতগুলো বের হয়ে এলো আর তাকে দেখাতে লাগলো ভয়ংকর। স্যারের এই চেহারাটা দেখেও মেয়েটা ভয় পেলো না, বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বলল, "প্লিজ স্যার আপনি মারবেন না। একজনকে মারলে কোন লাভ হয় না স্যার–"

আমি স্যারের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, স্যার রাগে অন্ধ হয়ে গেছেন, দিলীপকে নয় এখন এই খ্যাপা মেয়েটাকে মেরে বসবেন। আমি দেখতে পাচ্ছি তার হাত উপরে উঠে আসছে, আমি জানি এখন খপ করে মেয়েটার চুল ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন, তারপর মুখের মাঝে মারবেন। মেয়েটা কিছু লক্ষ্য করল বলে মনে হলো না, সে আগের মতোই ঠাণ্ডা গলায় বলতে লাগল, "স্যার আপনি আমার কথা বিশ্বাস না করলে অন্যদের জিজ্ঞেস করেন। জিজ্ঞেস করেন স্যার–"

রাজাকার স্যার জিজ্ঞেস করার কোন উৎসাহ দেখালেন না, মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন তখন আমি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম, "স্যার।"

স্যার মাথা ঘুরে তাকালেন। চোখ লাল করে বললেন, "কী?"

আমি ঠিক করেছি পালিয়ে যাব, এই স্কুলে আর আমাকে আসতে হবে না! আমি ইচ্ছে করলে যা খুশি করতে পারি, কেউ আমাকে কিছু বলতে পারবে না, কেউ কিছু করতেও পারবে না। এটাই আমার সবচেয়ে বড় সুযোগ। এই সুযোগটা হাত ছাড়া করা ঠিক হবে না– আমি হাত ছাড়া করলাম না; মুখ গম্ভীর করে বললাম, "কাউকে মারবেন না।"

প্রিয়াংকা নামের এই মেয়েটি কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারে, রাজাকার স্যারের ভয়ংকর চোখ রাঙানির সামনেই সে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলে যাচ্ছে! আমার অবস্থা ঠিক তার উল্টো। আমি গত কয়েক বৎসর বলতে গেলে কারো সাথে কথা বলি নাই, কীভাবে কথা বলতে হয় আমি সেটা ভুলেই গেছি। তাই আমি যখন বললাম, "কাউকে মারবেন না।" সেটা শুনালো এরকম : "খবরদার! কাউকে মারবেন না। মারলে একেবারে খুন করে ফেলব।"

আমার কথা শুনে রাজাকার স্যার একেবারে থতমত খেয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন, তারপর কয়েকবার চেষ্টা করে বললেন, "কী বললি?"

আমি বললাম, "বলেছি যে কাউকে মারবেন না।"

আমার গলার স্বরটা এবারে আগের থেকেও ভয়ানক শোনালো। কথা বলে অভ্যাস নেই বলে যেটাই বলি সেটাই ভয়ানক শোনায়, এবারের কথাটা শোনালো এরকম : "একটা কথা কয়বার বলতে হয়? শেষবারের মতো বলছি শুনে রাখেন, খবরদার আমাদের ক্লাসের কোন ছেলের গায়ে হাত তুলবেন না। যদি তুলেন তাহলে খবর আছে। খুন করে রাস্তায় লাশ ফেলে দেব! আমাকে চেনেন না? জন্মের মতো সিধে করে দেব।"

আমার কথায় ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। রাজাকার স্যার কেমন যেন মাছের মতো খাবি খেতে লাগলেন। সারা ক্লাশে একটা গুঞ্জন শুরু হলো— ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের যখন খুশি মারপিট করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গুঞ্জন। রাজাকার স্যার দুর্বল গলায় বললেন, "চুপ।"

কিন্তু কেউ চুপ করল না বরং গুঞ্জনটা আরো বেড়ে গেল। আমি চারিদিকে তাকিয়ে বললাম, "চুপ।" সাথে সাথে পুরো ক্লাস চুপ করে গেলো।

রাজাকার স্যার বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "মারলে কী করবি?"

আমি বললাম, "মেরে দেখেন কী করি।"

আমার কথা শুনে সারা ক্লাসে একটা আতংকের শিহরণ বয়ে গেল, আমি স্পষ্ট দেখলাম ভয়ে ছেলে-মেয়েদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। ছেলে-মেয়েদের থেকে বেশি ভয় পেলেন রাজাকার স্যার, মাছের মতো খাবি খেতে লাগলেন। স্যার কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না, আমি তাই মেঘের মতো গলার স্বরে বললাম, "দিলীপ, তুই তোর জায়গায় গিয়ে বস। প্রিয়াংকা তুমিও চলে আস।"

আমার কথা শুনে দিলীপ সুড়ুৎ করে নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ল। প্রিয়াংকাও কী করবে বুঝতে না পেরে নিজের জায়গায় ফিরে এলো। রাজাকার স্যার আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, আমিও সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখ থেকে আগুন বের হওয়া বলে একটা কথা আছে, আমি সেটাই চেষ্টা করলাম। গত কয়েক বছর আমি মোটামুটি একটা পশুর মতো সময় কাটিয়েছি। আমার আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা সবকিছু পশুর মতো হয়ে গিয়েছে, চোখের দৃষ্টিটাও মনে হয় সেইরকম হিংস্র হয়ে গেছে, রাজাকার স্যার সেই চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলেন না, চোখ সরিয়ে নিলেন।

স্যার কিছুক্ষণ ক্লাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর বইটা হাতে নিয়ে কাঁপা গলায় বললেন, "একত্রিশ পৃষ্ঠায় দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর লেখ। কথা বলবি না।"

কেউ কোন কথা বলল না, খাতা খুলে প্রশ্নের উত্তর লিখতে শুরু করল।

প্রিয়াংকা তার খাতা খুলতে খুলতে নিচু গলায় বলল, "তপু।"

আমি প্রিয়াংকার দিকে তাকালাম, বললাম, "কী হলো?"

"থ্যাংক ইউ তপু।" তারপর সে হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা একবার স্পর্শ করল।

আমি কিছু না বলে সামনের দিকে তাকালাম। আহা! কতোদিন পরে একজন আমার সাথে ভাল করে, সুন্দর করে কথা বলল। কেউ যখন এরকম ভালাবাসা নিয়ে কথা বলে তখন কী ভালই না লাগে। হঠাৎ করে আমার চোখে পানি এসে গেল।

আমি ভেবেছিলাম আমার চোখের সব পানি শুকিয়ে গেছে, আসলে শুকায় নি। বুকের ভিতরে গভীরে কোন একটা জায়গায় এখনো মনে হয় অনেক চোখের পানি জমে আছে।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম

আমি বাসা থেকে পালিয়ে যাওয়াটা কয়েক দিনের জন্যে পিছিয়ে দিলাম। কেন ঠিক পিছিয়ে দিলাম নিজেই জানি না, নিজেকে নিজে বোঝালাম যে বাসা থেকে সত্যি সত্যি পালিয়ে যাবার আগে আমার অন্তত একবার আম্মু, আপু আর ভাইয়ার সাথে শেষবার দেখা করে যাওয়া দরকার। সেটা অবশ্যি সত্যি কারণ হতে পারে না, আমাকে দেখলেই আম্মু যেভাবে খেপে যান যে দেখা না হওয়াই ভাল। আপু আর ভাইয়ার সাথে দেখা হলে তারা এতো অপ্রস্তুত হয়ে যায় যে কোথায় গিয়ে লুকাবে বুঝতে পারে না। তাই তাদের সাথে দেখা করে যাওয়াটাও আসল কারণ হতে পারে না। আমার ধারণা আসল কারণটা হচ্ছে প্রিয়াংকা, এই মেয়েটা একটু খ্যাপা টাইপের। মনে হচ্ছে ক্লাসে আরো কিছু অঘটন ঘটাবে, ঠিক কী অঘটন কীভাবে ঘটাবে সেটা দেখার একটা কৌতূহল হচ্ছে। তার ওপর রাজাকার স্যারকে যেভাবে হুমকি দিয়ে এসেছি সেটা নিয়ে স্কুলে একটু হৈচৈ হতে পারে, ব্যাপারটা কোন দিকে গড়ায় সেটা না দেখে পালিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

ডাইনিং টেবিলে বসে যখন আম্মু আপু আর ভাইয়া খেতে খেতে গল্প করে আমি তখন স্টোররুমে আমার বিছানাটায় গুটিশুটি মেরে বসে থাকি। তাদের কথাবার্তা পুরোটুকু শোনা যায় না, একটা দুটি কথা হঠাৎ মনে হয় ছিটকে ছিটকে আসে। আমি মাঝে মাঝে কান পেতে শোনার চেষ্টা করি তারা কী নিয়ে কথা বলে। আজকে মনে হচ্ছে তারা টেলিভিশনের কোন একটা নাটক নিয়ে কথা বলছে– আমার কাছে এসব কত দূরের একটা বিষয়। নাটকের কোন একটা চরিত্রের কথা বলে তিনজন হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল। তাদের হাসির শব্দ শুনে মনে হলো সেটা বুঝি অন্য কোন জগৎ থেকে ভেসে আসছে! শুনতে শুনতে আমার বুক ভেঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। আমি দুই হাতে নিজের কান চেপে ধরে বসে থাকি, সবকিছু ভুলে মাথাটা ফাঁকা করে দেবার চেষ্টা করতে থাকি। আগে হলে কোন একটা বই খুলে কিছু একটা পড়ার চেষ্টা করতাম, বাসা থেকে পালিয়ে যাব ঠিক করার পর সেটাও ছেড়ে দিয়েছি। বনে-

জঙ্গলে, নদীর তীরে হাঁটতে হাঁটতেই যখন জীবনটা কাটিয়ে দেব তখন শুধু শুধু পড়াশোনা করে সময় নষ্ট করে কী হবে?

ঠিক যখন রাত দশটার ঘণ্টা বাজলো তখন স্টোররুমের দরজার পিছন থেকে ছোট একটা নেংটি ইঁদুর খুব সাবধানে মাথা বের করল। নেংটি ইঁদুরের সময়ের জ্ঞান যে এতো ভাল আমি কখনো জানতাম না। গত কয়েক দিন থেকে লক্ষ্য করছি ঠিক দশটার সময় এই নেংটি ইঁদুরটা স্টোররুমের দরজার পিছন থেকে উঁকি দেয়। প্রথম কয়েক দিন আমাকে দেখেই লাফ দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, এখন আমাকে দেখে একটু অভ্যস্ত হয়েছে। নেংটি ইঁদুরের প্রিয় খাবার কী কে জানে– আমি রুটির কয়েকটা টুকরো ছড়িয়ে রেখেছিলাম, গত কয়েক দিন থেকে দেখছি টুকরোগুলো দুই হাতে ধরে কুট কুট করে খাচ্ছে। নেংটি ইঁদুরের খাওয়ার ভঙ্গিটা ভারি সুন্দর, দেখে আমার এতো মজা লাগে যে বলার মতো নয়। আমার হাতে ছোট এক টুকরো রুটি ছিল, সেটা এগিয়ে দিলাম, নেংটি ইঁদুরটা একটা ছোট লাফ দিয়ে সরে গেলো। দূর থেকে আমাকে সাবধানে লক্ষ্য করল, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে রুটির টুকরোটা মুখে করে একটু দূরে টেনে নিয়ে গেল। আমার দিকে সাবধানে তাকিয়ে সে দুই হাতে টুকরোটা ধরে কুটুর কুটুর করে খেতে শুরু করে। আমি ফিসফিস করে নেংটি ইঁদুরটাকে ডাকলাম, "এই! এই পিচকি। এই মিচকি!"

নেংটি ইঁদুরটা আমার ডাক শুনে খুব যে উৎসাহিত হলো সেরকম মনে হলো না, সাবধানে রুটির টুকরোটা নিয়ে আরেকটু দূরে সরে গেলো। আমি আরেকটু গলা উঁচিয়ে ডাকলাম, "মিচকি। এই মিচকি।"

নেংটি ইঁদুরটা এবার একটু ভড়কে গিয়ে তার রুটির টুকরোটা ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল। আমি অবশ্যি খুব হতাশ হলাম না, কারণ আমি জানি আগামীকাল রাত দশটার সময় সে আবার এসে হাজির হবে। আবার ইতিউতি তাকিয়ে আমার আরেকটু কাছে আসবে। এই বাসায় আমার একমাত্র বন্ধু এই নেংটি ইঁদুর, ব্যাপারটার মাঝে কোথায় জানি একটু দুঃখের চিহ্ন আছে।

পরের দিন ক্লাসে গিয়ে আমি মনে মনে আশা করছিলাম যে প্রিয়াংকা আজকেও আমার পাশে বসবে। কিন্তু দেখলাম সে আজকে অন্য পাশে বসেছে। আজকেও তার মুখে এক ধরনের হাসি, চারিদিকে দেখতে দেখতে পা দোলাচ্ছে, দেখে মনে হয় পুরো ক্লাসটা যেন একটা নাটকের দৃশ্য, সে যেন একজন দর্শক এবং

যেন খুব আগ্রহ নিয়ে নাটকটা দেখছে। আমি আমার সিটে বসলাম, অন্যদিন হলে ক্লাস রুমে থেকে বের হয়ে বাউন্ডারি ওয়ালে পা ঝুলিয়ে বসতাম। আজ আর বের হলাম না, প্রিয়াংকা যেরকম আগ্রহ নিয়ে পুরো ক্লাসকে দেখে আমিও অনেকটা সেভাবে দেখতে শুরু করলাম।

ব্যাপারটি মন্দ না, যেমন ধরা যাক ইশতিয়াকের ব্যাপারটা। সে যে এতো মনোযোগ দিয়ে কেনে আঙুল দিয়ে কান চুলকাতে পারে আমি সেটা জানতাম না। তাকে দেখে মনে হয় চুলকাতে চুলকাতে কানের মাঝে গর্ত করে ফেলবে। আদনান পকেট থেকে কী একটা বের করে মুখে দিয়ে খাচ্ছে, খুব সতর্কভাবে খাচ্ছে যেন কেউ বুঝতে না পারে। বুঝতে পারলে যদি ভাগ দিতে হয় সেজন্যে এরকম সাবধান। নাঈমা নামের ফর্সা মেয়েটা নিজের চেহারা নিয়ে নিশ্চয়ই খুব সচেতন, ব্যাগ থেকে ছোট একটা আয়না বের করে নিজেকে দেখে চুলগুলো একটু সামনে নিয়ে এসে আবার আয়নাটা ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল। মুশফিক আর জহুরুল গল্প করছে, কি নিয়ে গল্প করছে শোনা যাচ্ছে না কিন্তু বিষয়টা নিশ্চয়ই খুব মজার। দুইজনে দাঁত বের করে হি হি করে হাসছে! মানুষকে হাসতে দেখা খুব মজার একটা বিষয়, তাদেরকে দেখে আমারও হাসি পেয়ে গেলো!

আমাদের ক্লাসের দুই ভাল ছাত্র জয়ন্ত আর মামুন নিশ্চয়ই কোন জ্ঞানের বিষয় নিয়ে কথা বলছে কারণ দুইজনের চোখে-মুখেই এক ধরনের গম্ভীর ভাব। তারা কথা বলতে বলতে আমার কাছাকাছি চলে এলো বলে জ্ঞানের বিষয়টা আমিও শুনতে পেলাম, জয়ন্ত বলছে, "বল দেখি কোন সংখ্যাকে যতবার সেটা দিয়ে গুণ করা হোক প্রথম সংখ্যা সেটাই হয়?"

এই সহজ বিষয়টা নিয়ে দুইজন এরকম গম্ভীর হয়ে কথা বলছে দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল! এরকম সংখ্যা দুটি হচ্ছে পাঁচ আর ছয়। মামুন দেখলাম কয়েকবার মাথা চুলকে চিন্তাভাবনা করে বলল, "পাঁচ।"

জয়ন্ত বলল, "আরো একটা আছে।"

মামুন আবার মাথা চুলকাতে শুরু করল। একটু চিন্তা করে বলল, "ছয়।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। এবার বল দেখি দুই অংকের কোন সংখ্যাকে যতবার নিজের সাথে গুণ করা যায় ততবার প্রথমে সেই সংখ্যাটা পাওয়া যায়?"

মামুনকে আবার একটু বিভ্রান্ত দেখায়। ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে শুরু করে। মামুন সবসময় পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়, অথচ এরকম সহজ একটা জিনিস চিন্তা করে বের করতে তার এতোক্ষণ লাগে? যে কেউ বলতে পারবে, সংখ্যাটা হচ্ছে পঁচিশ!

মামুন বলল, "দাঁড়া ক্যালকুলেটরটা নিয়ে আসি।"

জয়ন্ত বলল, "উঁহুঁ ক্যালকুলেটর দিয়ে করলে হবে না। এমনি এমনি বের করতে হবে।"

মামুন বলল, "এতগুলো গুণ করব? একশ'টার মতো–"

আমার আবার হাসি পেলো, শুধু নামেই ফাস্ট-সেকেন্ড আসলে মাথায় কিছু নেই। বোঝাই যাচ্ছে সংখ্যার প্রথম অংকটা হবে পাঁচ না হয় ছয়। শুধু সেই সংখ্যাগুলো পরীক্ষা করলে হয়। যেমন পনেরো, পঁচিশ, পঁয়ত্রিশ– কিংবা ষোল, ছাব্বিশ, ছত্রিশ। কতোক্ষণ আর লাগবে?

মামুন এবারে একটা কাগজ নিয়ে গুণ করতে শুরু করল, কী আশ্চর্য! এই সংখ্যাগুলো গুণ করতে কাগজ-কলম লাগে? মাথার ভিতরেই তো করে ফেলা যায়। পঁচিশ পঁচিশে ছয়শ পঁচিশ, পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশে বারোশ পঁচিশ, পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশে দুই হাজার পঁচিশ।

মামুন অনেক সময় লাগিয়ে সবগুলো গুণ করে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "পঁচিশ।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, "গুড।"

তারপর দুজন হেঁটে চলে গেলো। দুই অংকের আরেকটা সংখ্যা হচ্ছে ছিয়াত্তর, এই দুজন সেটা মনে হয় জানেই না। আমার একবার ইচ্ছে হলো জয়ন্ত আর মামুনকে ডেকে সেটা বলি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু বললাম না। এরা হচ্ছে ক্লাসের ভাল ছেলে তারা জ্ঞানের কথাবার্তা বলে, আমি হচ্ছি ক্লাসের খারাপ ছেলে আমিও যদি তাদের সাথে জ্ঞানের কথাবার্তায় যোগ দিই তাহলে তারা ভড়কে যেতে পারে।

জয়ন্ত আর মামুন চলে যাবার পর আমি হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম দুই অংকের সংখ্যা পঁচিশ এবং ছিয়াত্তরের মতো তিন অংকেরও দুটি সংখ্যা আছে সেগুলো হচ্ছে তিনশ' ছিয়াত্তর আর ছয়শ' পঁচিশ। শুধু তাই না চার অংকেরও একটা সংখ্যা আছে সেটা হচ্ছে নয় হাজার তিনশ' ছিয়াত্তর। এর চাইতে বড় সংখ্যাও আছে আমি সেটা ভেবে বের করতে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ আমার একটা অন্য জিনিস মনে হলো। জয়ন্ত আর মামুন দুইজন হচ্ছে আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্র, তাদের এই সহজ জিনিসগুলো বের করতে এতো সমস্যা হচ্ছে কেন? নাকি উল্টোটা সত্যি, যে জিনিসগুলো এতো সহজ নয়, কোন কারণে আমার কাছে সহজ মনে হচ্ছে? বিষয়টা কীভাবে পরীক্ষা করা যায়? কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারলে হতো, কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করব? আমার একমাত্র বন্ধু হচ্ছে বাসায় সেই নেংটি ইঁদুরটি। সে আসবে রাত দশটায়, তাকে

যদি জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা মিচকি, বল দেখি কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে প্রথমে সেই সংখ্যাটা পাওয়া যায়? তখন সে কী করবে? বিষয়টা চিন্তা করেই আমার একটু হাসি পেয়ে গেলো।

আমি ক্লাসে বহুকাল কোন কিছুতেই মনোযোগ দিই না, আজকে জ্যামিতি ক্লাসে একটু মনোযোগ দিয়ে স্যারের কথা শোনার চেষ্টা করলাম এবং অবাক হয়ে লক্ষ করলাম স্যার ক্লাসে রীতিমতো হাস্যকর জিনিস পড়াচ্ছেন। অনেক কষ্ট করে একটা উপপাদ্য প্রমাণ করলেন যেটা অনেক সহজেই অন্যভাবে প্রমাণ করা সম্ভব কিন্তু আমি সেটা বলার চেষ্টা করলাম না। আমি অনেক দিন পর আমাদের গণিত বইটা উল্টেপাল্টে দেখলাম, ভিতরের বিষয়বস্তু আশ্চর্য রকম সহজ। আমি আবার একটা ধন্ধের মাঝে পড়ে গেলাম– বিষয়টা আসলেই সহজ নাকী আমার কাছে সহজ মনে হচ্ছে?

দুপুর বেলা ইংরেজি ক্লাস হচ্ছে তখন স্কুলের দপ্তরি কালীপদ ইংরেজি স্যারের কাছে একটা চিরকুট নিয়ে এলো। স্যার চিরকুট পড়ে ভুরু কুঁচকালেন, আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আরিফুল ইসলাম তপু আর প্রিয়াংকা চৌধুরী কে?"

ক্লাসের দুই পাশ থেকে আমি আর প্রিয়াংকা উঠে দাঁড়ালাম। স্যার খানিকক্ষণ আমাদের দুজনকে একটু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন তারপর বললেন, "তোমাদের দুইজনকে প্রিন্সিপাল ডেকে পাঠিয়েছেন।"

সারা ক্লাসে আতংকের একটা ফিসফিসানি শোনা গেলো। আমাদের স্কুলের আগের প্রিন্সিপাল ছিলেন খুব হাসিখুশি মানুষ। মাসখানেক হলো নতুন প্রিন্সিপাল এসেছেন, তিনি মহিলা এবং কমবয়সী। তার চেহারা খুব সুন্দর কিন্তু সেটা যেন কেউ বুঝতে না পারে সেজন্যে একেবারে সাজগোঁজ করেন না। বুড়ো মানুষের একটা চশমা পরে থাকেন এবং সব সময় মুখটা পাথরের মতো শক্ত করে রাখেন। আমরা শুনেছি এই ম্যাডাম নাকী অসম্ভব কড়া, আমাদের পুরো স্কুলটাকে এক মাসের মাঝে একেবারে ধনুকের ছিলার মতো সোজা করে ফেলেছেন! সেই প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমাদের দুজনকে ডেকে পাঠিয়েছেন সেটা একটা ভয়ের ব্যাপার হতেই পারে।

ইংরেজি স্যার বললেন, "যাও দেখা করতে যাও।"

আমি আর প্রিয়াংকা দপ্তরি কালীপদের সাথে ক্লাস রুম থেকে বের হলাম। প্রিয়াংকা গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপার কী তপু? আমাদের ডেকেছে কেন?"

"রাজাকার স্যার নিশ্চয়ই নালিশ করেছে।"

"কী স্যার?"

"রাজাকার স্যার।" আমি ব্যাখ্যা করলাম, "বাংলা স্যারের নাম হচ্ছে রাজাকার স্যার।"

"কেন?"

"কয়দিন থাকলেই বুঝতে পারবে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় নাকী রগ কাটতেন।"

শুনে প্রিয়াংকা কেমন যেন চমকে উঠল। আমার দিকে এমন ভাবে তাকালো যে আমি বুঝতে পারলাম সে আমার কথা বিশ্বাস করে নাই। না করলে নাই– কয়দিন গেলে নিজেই বুঝতে পারবে।

প্রিন্সিপাল ম্যাডামের রুমে গিয়ে বুঝতে পারলাম, আমার ধারণা সত্যি। রাজাকার স্যার প্রিন্সিপাল ম্যাডামের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছেন। কালীপদ বলল, "আপা এই যে, এই দুইজন।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কী একটা কাগজ দেখছিলেন, সেটা সরিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। তার চোখের দৃষ্টি খুব পরিষ্কার, মুখে কিছু না বললেও চোখ দিয়ে বলছেন, "তোমাদের মতো পাঁজী নচ্ছাড় বেয়াদব ছেলে-মেয়ে আমি অনেকবার দেখেছি, আগে আমি তাদের সিধে করে ছেড়ে দিয়েছি, তোমাদেরকেও সিধে করে ছাড়ব।"

আমি আর প্রিয়াংকা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। বড় একটা টেবিল ঘিরে বেশ কয়েকটা চেয়ার। ভারি পর্দা, দেয়ালের সাথে লাগানো বেশ কয়েকটা শেলফ, সেগুলো বোঝাই বই দিয়ে। এক পাশে একটা আলমারি, সেখানে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা স্পোর্টস, ডিবেট, ছবি আঁকার কম্পিটিশান এসব করে যেসব কাপ, শিল্ড আর মেডেল এনেছে সেগুলি সাজানো আছে। আমি খারাপ হয়ে যাবার আগে যখন খুব ভাল ছিলাম তখন ডিবেট করে বড় একটা কাপ এনেছিলাম। সেই কাপটাও নিশ্চয়ই এখানে কোথাও আছে।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একবার আমার দিকে আরেকবার প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "তোমাদের বিরুদ্ধে আমি যেটা শুনছি সেটা সত্যি?"

আমি কিছু বললাম না, শুধু উদাস মুখে শরীরের ভরটা এক পা থেকে অন্য পায়ের উপর সরিয়ে নিলাম। প্রিয়াংকা খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারে, সে বলল, "আপনি কী শুনেছেন সেটা জানলে বলতে পারতাম ম্যাডাম।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম রাজাকার স্যারকে দেখিয়ে বললেন, "তোমাদের এই স্যার বলেছেন, তোমরা তার সাথে খুব বড় বেয়াদবি করেছ।"

প্রিয়াংকা ম্যাডামের কথা শুনে একটুও ঘাবড়াল না, বেশ হাসি হাসি মুখে বলল, "স্যার যদি বলে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই সেটা সত্যি। স্যারের কাছে নিশ্চয়ই মনে হয়েছে আমরা বেয়াদবি করে ফেলেছি। কিন্তু ম্যাডাম–"

"কিন্তু কী?"

"আমরা একটুও বেয়াদবি করতে চাইনি ম্যাডাম।"

"করতে না চাইলে সেটা কেমন করে হয়?"

রাজাকার স্যার হঠাৎ করে সোজা হয়ে বসে বললেন, "আমি আপনাকে বলি কী হয়েছে। এই যে মেয়েটাকে দেখছেন, এ নতুন এসেছে। কোন স্কুল থেকে এসেছে জানি না। ডিসিপ্লিনের খুব অভাব– ক্লাসে ঢুকেই দেখি পিছনের বেঞ্চে বসে কথা বলছে। আমি বললাম, সামনে এসে বসো। সে বলল বসবে না। কতো বড় বেয়াদব শুধু যে সামনে এসে বসল না তা না, আমার সাথে মুখে মুখে তর্ক জুড়ে দিল।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম শীতল চোখে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কিছু বলার আছে মেয়ে?"

প্রিয়াংকা একটু চোখ বড় বড় করে একবার প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একবার রাজাকার স্যারের দিকে তাকাচ্ছিল, এক মুহূর্তের জন্যে একবার আমার দিকেও তাকালো। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এবার ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "আছে কিছু বলার?"

প্রিয়াংকা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে, ভাল ফুটবল খেলা বা ভাল গান গাইতে পারার মতো এটাও নিশ্চয়ই একটা বড় গুণ। আমি শুনলাম প্রিয়াংকা বলল, "জি ম্যাডাম, আমার কিছু বলার তো নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমার মনে হয় কিছু না বলাটাই সবচেয়ে ভাল হবে।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ভুরু কুঁচকে বললেন, "কেন? না বলাটা কেন ভাল হবে?"

"যদি আমি কিছু বলি সেটা অন্যরকম শুনাবে। মনে হবে, মনে হবে–"

"কী মনে হবে?"

"মনে হবে স্যার যে কথাটা বলছেন আমি সেটা অস্বীকার করছি।"

রাজাকার স্যার এবারে কেমন যেন খেপে গেলেন, প্রায় টেবিলে থাবা দিয়ে বললেন, "দেখেছেন? দেখেছেন কতো বড় বেয়াদব? বলার চেষ্টা করছে আমি মিথ্যা কথা বলছি–"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম হাত তুলে রাজাকার স্যারকে থামালেন। তারপর আমার দিকে ঘুরে তাকালেন, বললেন, "আর তুমি? তুমি কী করেছ?"

আমি কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাজাকার স্যার বললেন, "এর কথা ছেড়ে দেন ম্যাডাম। একে যদি এখনই টি.সি. দিয়ে স্কুল থেকে বিদায় না করেন তাহলে কিন্তু স্কুলের বেইজ্জতি হয়ে যাবে।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ভুরু কুঁচকে রাজাকার স্যারের দিকে তাকালেন, "কেন?"

"আর কয়দিন পরে এই ছেলে মানুষ মার্ডার করবে। এর চেহারাটা একবার দেখেন। এর কতো বড় সাহস, ক্লাসে আমাকে থ্রেট করে-"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমার দিকে ভাল করে তাকালেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যি?"

আমি এবারেও কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইলাম। কথা না বলতে বলতে আমি ঠিক করে কথা বলতেই ভুলে গেছি। মুখ খুলে কিছু একটা বলতে গেলেই উল্টাপাল্টা কিছু একটা বলে ফেলব তখন আরো বড় ঝামেলা হয়ে যাবে। এর থেকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল।

রাজাকার স্যার থামলেন না, বললেন, "আপনি নতুন এসেছেন তাই আপনি জানেন না। এ একসময়ে খুব ভাল ছাত্র ছিল। তারপর হঠাৎ করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বদমাইশ হয়ে গেলো- এখন পরীক্ষায় পাস করতে পারে না। দিনরাত রাস্তাঘাটে মারামারি করে। রীতিমতো গুণ্ডা। সন্ত্রাসী।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আবার আমার দিকে তাকালেন, খানিকক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যি?"

আমি এবারেও কিছু বললাম না। এই পৃথিবীতে বিচার বলে যে কিছু নেই সেটা আমার থেকে ভাল করে কেউ জানে না, কাজেই প্রিন্সিপাল ম্যাডাম যে রাজাকার স্যারের কথা বিশ্বাস করে আমাকে টি.সি. দিয়ে বিদায় করে দেবেন সে ব্যাপারে আমার একটুও সন্দেহ নাই। তবে এখন তাতে আর কিছু আসে যায় না, আমি বাসা থেকে যখন পালিয়েই যাব তখন টি.সি. নিয়ে আর না নিয়ে পালিয়ে যাবার মাঝে পার্থক্য কী?

রাজাকার স্যার বললেন, "এক ঝুড়ি আপেলের মাঝে একটা পচা আপেল থাকলে সব আপেল পচে যায়। এ হচ্ছে পচা আপেল, একে যদি এখনই বিদায় না করেন পুরো ক্লাসকে কিন্তু নষ্ট করে দেবে।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমার দিকে তাকালেন, "তোমার কিছু বলার আছে?"

আমার অনেক কিছুই বলার আছে কিন্তু আমি তো গুছিয়ে কথা বলতে পারব না। তবে সারা জীবনের জন্যে যখন চলেই যাচ্ছি তখন যা খুশি বলে

দিলে ক্ষতি কী? আর কেউ তো কখনো এটা করতে পারবে না। আমি প্রিন্সিপাল ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললাম, "জি ম্যাডাম। বলার আছে।"

"কী বলার আছে?"

"আমাকে যদি বের করতেই হয় তাহলে ঐ স্যারকেও বের করে দিতে হবে।"

কথাটা আমি ভেবে বলি নাই, বলে ফেলার পর কথাটা শুনে আমি নিজেই চমকে উঠলাম, বলেছি কী আমি? কিন্তু বলে যখন ফেলেছিই এটা তো আর ফিরিয়ে নেয়ার উপায় নেই। রাজাকার স্যারের চোয়ালটা কেমন যেন ঝুলে পড়ল, মাছের মতো খাবি খেলেন কয়েকবার। প্রিয়াংকা বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে মনে হলো আমার কথা বুঝতে পারছেন না। খুব ধীরে ধীরে তার মুখটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেলো, শোনা যায় না এরকম গলায় আস্তে আস্তে বললেন, "ছেলে, তোমার তো সাহস কম না, তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার স্যারের সম্পর্কে এরকম একটা কথা বলো?"

প্রিয়াংকা আমার জায়গায় হলে নিশ্চয়ই কী চমৎকার একটা উত্তর দিতে পারতো, আমি কিছুই বলতে পারলাম না। কী বলা যায় সেটা চিন্তা করতে করতে আবার নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম, "আমি যদি পচা আপেল হই তাহলে স্যারও পচা আপেল।"

আমার কথা শুনে প্রিন্সিপাল ম্যাডামের চোখগুলো বড় বড় হয়ে উঠল। ম্যাডাম তার চশমাটা খুলে টেবিলে রেখে বললেন, "ছেলে, তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না।"

"তাহলে?"

আমি চুপ করে দাড়িয়ে রইলাম। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বললেন, "তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?"

রাজাকার স্যার আমার জন্যে উত্তরটা দিয়ে দিলেন, বললেন, "এই পাঁজী ছেলেটা এইভাবেই কথা বলে। এর মতো বেয়াদব ছেলে স্কুলে আর একটাও নাই।"

আমি রাজাকার স্যারের দিকে না তাকিয়ে প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে বললাম, "ম্যাডাম, আমাকে তো স্কুল থেকে তাড়িয়েই দিবেন, তাই যাওয়ার আগে আপনাকে সত্যি কথাটা বলে যাই।"

রাজাকার স্যার চিৎকার করে বললেন, "চোপ। চোপ বেয়াদব ছেলে–"

আমি তখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছি, আরও গলা উঁচিয়ে বললাম, "এই স্যার ক্লাসে কখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতা পড়ান না। এই স্যার মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে ক্লাসে টিটকারি মারেন। এই স্যার হিন্দু ছাত্রদের পিটান–"

রাজাকার স্যারের মুখটা ভয়ংকর রাগে কেমন যেন বিকৃত হয়ে গেল, ঘরে আর কেউ না থাকলে একেবারে নিশ্চয়ই আমাকে খুন করে ফেলতেন। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কেমন যেন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, বললেন, "তুমি কী বলছ ছেলে?"

আমি সোজাসুজি প্রিন্সিপাল ম্যাডামের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি সত্যি কথা বলছি।"

রাজাকার স্যার হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে বললেন, "আপনি আমার সাথে আসেন ম্যাডাম। ক্লাসে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন–"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এক ধরনের অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ঘুরে রাজাকার স্যারের দিকে তাকালেন, বললেন, "তার কোন প্রয়োজন নেই সরকার সাহেব।"

"তাহলে, তাহলে–"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এক ধরনের ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "আমি ব্যাপারটা দেখছি। আপনি এখন আসুন।"

রাজাকার স্যার হঠাৎ করে কেমন জানি চুপসে গেলেন। দাঁড়িয়ে থেকে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন, ঠিক বলতে পারলেন না, একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন তারপর বের হয়ে গেলেন।

আমি আর প্রিয়াংকা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম অন্যমনস্কভাবে টেবিলে আঙুল দিয়ে শব্দ করতে করতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। তাকে দেখে মনে হতে লাগলো যেন ভুলেই গেছেন আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

আমরা কী করব বুঝতে পারছিলাম না তখন ম্যাডাম আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা ক্লাসে যাও।"

আমি আর প্রিয়াংকা প্রিন্সিপাল ম্যাডামের অফিস থেকে বের হয়ে এলাম।

কবিতা এবং মুক্তিযুদ্ধ

জ্যামিতির ক্লাস টেস্টে মামুন পেলো আশি, জয়ন্ত সত্তুর অন্যেরা তার থেকে অনেক কম। পরীক্ষাটি ছিল একেবারে পানির মতো সোজা আমি নিখুঁতভাবে প্রত্যেকটার উত্তর লিখেছি কিন্তু আমি পেয়েছি শূন্য। ক্লাস টেস্টের খাতা দেয়ার সময় স্যার বলেছেন আমাকে কেন শূন্য দিয়েছেন, আমি অন্যের খাতা দেখে লেখেছি বলে কোন নম্বর দেন নি। খাতা দেওয়ার সময় জ্যামিতি স্যার ন্যায় এবং সততার উপরে বড় একটা লেকচার দিলেন। অন্যের খাতা দেখে লিখলে কিছু যে শেখা যায় না উল্টো একজন অপরাধী হিসেবে বড় হতে হয়, চরিত্রের মাঝে হীনম্মন্যতা ঢুকে যায়– স্যার সেটাও খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দিলেন।

সবই ঠিক আছে, কিন্তু একটিমাত্র সমস্যা— আমি কারো খাতা দেখে লিখি নি। জ্যামিতির উপপাদ্য আর সম্পাদ্যগুলো আমি নিজেই করেছি, স্যারকে আর সেটা বলার চেষ্টা করলাম না। তাহলে অন্যের খাতা দেখে লেখার সাথে সাথে মিথ্যা কথা বলার অপরাধটাও যোগ হবে! এমনিতেই নানারকম ঝামেলার মাঝে আছি তার মাঝে এই নতুন ঝামেলা শুরু করার কোন ইচ্ছে নেই। স্যার ক্লাসে উপপাদ্য এবং সম্পাদ্যগুলো বুঝিয়ে দিলেন, কয়েকটা আরো অনেক সহজভাবে করা যায়, স্যার সেটা জানেন না।

ক্লাসের শেষে প্রিয়াংকা আমার কাছে এলো, বলল, "তপু।"

আমি বললাম, "কী?"

"তোমার ক্লাস টেস্টের খাতাটা আমাকে দেখাবে?"

"কেন?"

"কারণ আছে।"

আমি বললাম, "আমি শূন্য পেয়েছি। আমার খাতা দেখে কোন লাভ নাই। মামুন না হলে জয়ন্তের খাতাটা দেখো।"

প্রিয়াংকা বলল, "আমি তোমারটাই দেখতে চাই।"

আমি আমার খাতাটা বের করে দিলাম। প্রিয়াংকা খানিকক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখে খাতাটা আমাকে ফেরত দিয়ে বলল, "তোমার সবগুলো ঠিক হয়েছে।"

আমি মাথা নাড়লাম বললাম, "হ্যাঁ।"

"স্যার বলেছেন তুমি অন্যের থেকে দেখে লেখেছ তাই তোমাকে শূন্য দিয়েছেন।"

আমি আবার মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ।"

"ক্লাস টেস্টের দিনে আমি তোমার পিছনে বসেছিলাম আমি দেখেছি তুমি কারো খাতা দেখে লিখ নি। তুমি নিজে নিজে লিখেছ।"

আমি এইবার একটু হাসলাম, বললাম, "হ্যাঁ।"

"তুমি কেন সেটা স্যারকে বললে না?"

"আমি যদি বলতাম স্যার সেইটা বিশ্বাস করতো না। কোন ভাল জিনিসের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই– তুমি সেটা জানো না?"

প্রিয়াংকা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, "তুমি এতো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছ কেন?"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

আমি ক্লাস টেস্টের খাতাটা ব্যাগের ভিতরে ঢুকিয়ে বললাম, "এর মাঝে বোঝার কিছু নাই।"

প্রিয়াংকা বলল, "তুমি খুব ভাল অঙ্ক জানো তাই না?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "উঁহুঁ।"

"তোমার কী অঙ্ক ভাল লাগে?"

আমি আমার সিটে হেলান দিয়ে বললাম, "আমার কিছু ভাল লাগে না।"

প্রিয়াংকা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের জায়গায় ফিরে গেলো।

থার্ড পিরিয়ডে বাংলা ক্লাসে রাজাকার স্যার আসবেন, আমি ভিতরে ভিতরে একটা কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছি, স্যার ক্লাসে এসে আজকে কী করেন দেখতে চাই। আজকেও জয়ন্ত দীলিপ আর সলীলকে পেটান কী না, নীলিমা আর মাধুরীকে খামোখা যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগাল করেন কী না দেখার জন্যে খুব কৌতূহল হচ্ছে।

কিন্তু আজ একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটলো, ক্লাসে রাজাকার স্যারের বদলে এলেন প্রিন্সিপাল ম্যাডাম। আমরা সবাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম হাত দিয়ে আমাদের বসার জন্যে ইঙ্গিত করে বললেন "বসো। বসো।"

আমরা নিজেদের জায়গায় বসেছি। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম পুরো ক্লাসে একবার

চোখ বুলিয়ে বললেন, "আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি নিয়মিত কোন একটা ক্লাস নিই, কিন্তু এমন ঝামেলার মাঝে থাকি ক্লাস নেবো কেমন করে– অফিস থেকেই বের হতে পারি না!"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কথা শেষ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন আর সাথে সাথে আমরা সবাই আবার বুঝতে পারলাম, প্রিন্সিপাল ম্যাডামের চেহারা খুব সুন্দর, তিনি শুধু সেটা কাউকে জানতে দিতে চান না। প্রিন্সিপাল ম্যাডামের হাসিটি পুরো ক্লাসের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল এবং আমরা সবাই কোন কারণ ছাড়াই হাসলাম।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের একটু খোঁজখবর নিলেন, কার নাম কী, বাসা কোথায়– এসব ব্যাপার নিয়েও দুই-চারজনের সাথে কথা বললেন। পড়াশোনা কেমন হচ্ছে জানতে চাইলেন, তারপর হালকা পায়ে একটু হেঁটে ক্লাসরুমের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে বললেন, "এটা তোমাদের বাংলা ক্লাস, তাই বাংলা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলা দরকার, কী বলো?"

আমরা সবাই মাথা নাড়লাম। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম সবার দিকে এক নজর তাকিয়ে বললেন, "আচ্ছা বল দেখি বাংলা ভাষাটাকে একটা নতুন মাত্রা দেয়ার জন্যে যদি শুধুমাত্র একজন মানুষের নাম বলতে হয় সেই মানুষটা কে হবে?"

ক্লাসের অনেকে উত্তর বলার জন্যে হাত তুললো এবং যাদের উৎসাহ বেশি তারা চিৎকার করে বলল, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম মাথা নাড়লেন, বললেন, "ভেরি গুড।" তারপর আর দুই পা এগিয়ে এসে বললেন, "এই বুড়ো মানুষটি বাংলা ভাষাকে যতটুকু সমৃদ্ধ করেছেন পৃথিবীর আর কোন মানুষ একা তাদের ভাষাকে ততটুকু সমৃদ্ধ করতে পারে নি।"

সত্যি কথা বলতে কী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন না অনেকে মিলে করেছেন সেটা নিয়ে ক্লাসের ছেলেমেয়েদের খুব একটা মাথাব্যথা আছে বলে মনে হলো না। তবে ম্যাডাম এতো সুন্দর করে কথা বলেন যে সবাই ভাব করতে লাগল ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আরেকটু এগিয়ে এসে বললেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন সেটা কীভাবে বোঝা যায় বলো দেখি?"

এবারে সবাই মুখ গম্ভীর করে চিন্তা করতে লাগল কী বলা যায়। কেউ কিছু বলার আগেই ম্যাডাম নিজে থেকে বললেন, "সেটা বোঝার জন্যে রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য নিয়েও গবেষণা করতে হয় না– তার যে কোন একটা কবিতা পড়লেই সেটা বুঝে ফেলা যায়।"

কথা শেষ করে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এমনভাবে আমাদের দিকে তাকালেন যে আমরা সবাই তার কথা বিশ্বাস করে ফেললাম। ম্যাডাম এবার একেবারে সামনের বেঞ্চে হাত রেখে আস্তে আস্তে বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই কখনো না কখনো রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছ। আমি বাজি ধরে বলতে পারি তোমাদের অনেকের রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ আছে। কে আমাদের একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে পারবে?"

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ কবিতাটি আবৃত্তি করতাম, অনেক দিন সেটা প্র্যাকটিস করি নি কিন্তু আমার নিশ্চয়ই এখনো মনে আছে, কিন্তু আমি আবৃত্তি করার কোন আগ্রহ দেখলাম না। আমি যদি এখন এই কবিতাটি আবৃত্তি করার চেষ্টা করি সেটা এতো বেখাপ্পা শোনাবে যে বলার মতো নয়। আমি এখন একটা দুষ্টু ও পাঁজী ছেলে– দুষ্টু এবং পাঁজী ছেলেরা কখনো কবিতা আবৃত্তি করে না।

জয়ন্ত প্রথমে সোনার তরী কবিতাটি শোনালো– ঠিক আবৃত্তি নয় মুখস্ত বলে গেলো। তারপর আমাদের ক্লাসের শিল্পী মৌটুসী আজি হতে শতবর্ষ পরে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনালো। মৌটুসীর গলা খুব ভাল, উচ্চারণও সুন্দর, তাই খুব সুন্দর শোনালো কবিতাটি। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম খুব খুশি হলেন শুনে। তখন প্রিয়াংকা হাত তুললো কিছু একটা বলার জন্যে। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন "তুমি কোন কবিতাটা আবৃত্তি করতে চাও?"

প্রিয়াংকা বলল, "আমি আবৃত্তি করতে চাই না ম্যাডাম।"

"তাহলে?"

"আপনি আমাদের একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনান।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম অবাক হয়ে বললেন, "আমি?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম।" প্রিয়াংকা খুব সহজ গলায় বলল, "আপনার সবচেয়ে প্রিয় কবিতাটা একটু আবৃত্তি করে শোনাবেন প্লিজ!"

প্রিয়াংকা মেয়েটা একটু অন্যরকম। এমনভাবে প্রিন্সিপাল ম্যাডামের সাথে কথা বলছে যেন তাঁর সাথে তার কতো দিনের পরিচয়, যেন ম্যাডাম আমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল নন, যেন আমাদের ক্লাসেরই আরেকজন। প্রিয়াংকা না হয়ে অন্য কোন একজন এই কথা বললে সেটা কিন্তু মোটেই এতো স্বাভাবিক শোনাতো না।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কিছুক্ষণ কিছু একটা ভাবলেন, ভেবে বললেন, "আমার প্রিয় কবিতা তো একটা নয়, অনেকগুলো।"

প্রিয়াংকা বলল, "তার মাঝে যে কোন একটা আবৃত্তি করেন, প্লিজ।"

আমার ধারণা ছিল ম্যাডাম হয়তো রাজি হবেন না, কিন্তু একটু অবাক হয়ে দেখলাম বেশ সহজেই রাজি হয়ে গেলেন, কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে সরাসরি আবৃত্তি শুরু করে দিলেন,

> "আমরা দুজন একই গাঁয়ে থাকি,
> সেই আমাদের একটি মাত্র সুখ।
> তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখী
> তাহার গানে আমার নাচে বুক।"

ম্যাডাম এতো সুন্দর করে কবিতাটা শোনাতে লাগলেন যে খঞ্জনা নামের সেই গ্রামের পুরো দৃশ্যটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম এই গ্রামটির ভেতর দিয়ে অঞ্জনা নামের নদীটি বয়ে যাচ্ছে আর সেই নদীর তীরে রঞ্জনা নামে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি কথা বলতে কী গান কবিতা এইসব জিনিসকে সব সময় আমার কাছে ন্যাকামি টাইপের জিনিস বলে মনে হতো– যারা এগুলো করে তাদেরকে মনে হতো হাস্যকর একধরনের মানুষ। কিন্তু প্রিন্সিপাল ম্যাডামের মুখে কবিতাটা শুনে আমার সমস্ত ধারণাটাই পাল্টে গেলো, আমার মনে হতে লাগলো কবিতার মতো সুন্দর জিনিস পৃথবীতে আর কিছু নেই। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম যে খুব সুন্দর করে আবৃত্তি করেন তা নয় কিন্তু কবিতার মাঝে এমনভাবে তার সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন যে কবিতাটা একেবারে অন্যরকম কিছু একটা হয়ে গেলো। কবিতাটা শেষ হবার পরও আমরা কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে বসে থাকলাম, আমাদের মনে হতে লাগল আমরা যদি কথা বলি তাহলে কিছু একটা নষ্ট হয়ে যাবে– সেই কিছু একটা যে কী আমরা কেউই সেটা ঠিক ধরতে পারছিলাম না।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "অনেক দিন পর আজকে একটা কবিতা বললাম।"

শিউলি বলল, "আপনি এতো সুন্দর করে কবিতা বলেন ম্যাডাম!"

শিউলি আমাদের ক্লাশের সবচেয়ে চুপচাপ মেয়ে, সে যে এভাবে নিজে থেকে কিছু বলবে আমরা বুঝতেই পারি নি, কিন্তু কথাটাকে একটুও অস্বাভাবিক মনে হলো না। আমরা সবাই শিউলির কথার সাথে সাথে মাথা নাড়লাম। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বললেন, "আসলে আমি সুন্দর করে কবিতা বলি নি, কবিতাটাই খুব সুন্দর।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম হালকা পায়ে হেঁটে হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে একবার বাইরে তাকিয়ে আবার ক্লাসের মাঝামাঝি এসে বললেন, "কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সারা পৃথিবীর সকল কবি সাহিত্যিক গীতিকার থেকে একটি বিষয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে আছেন, সেটা কী কে বলতে পারবে?"

মামুন হাত তুলে বলল, "সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন?"

"উঁহুঁ।" ম্যাডাম মাথা নাড়লেন, "নোবেল প্রাইজ তো অনেকেই পেয়েছেন– সেটি নয়। অন্য কিছু আছে–।"

ক্লাসের সবাই মাথা চুলকাতে লাগলো তখন ম্যাডাম নিজেই বললেন, "কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একমাত্র মানুষ যার লেখা গান দুটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের জাতীয় সঙ্গীত। একটি আমাদের বাংলাদেশের, আরেকটা ভারতবর্ষের।"

আমি এটা জানতাম না, শুনে বেশ অবাক হয়ে গেলাম।

ম্যাডাম একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি এটা এতো মধুর একটা গান, কিন্তু যতবার এই গানটা আমি শুনি ততবার চোখে পানি এসে যায়।"

মৌটুসি জিজ্ঞেস করল, "কেন ম্যাডাম?"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "জানি না কেন, মনে হয় মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ছোট ছিলাম, প্রতিদিন এই গানটা শুনতাম আর ভাবতাম কবে আমাদের দেশটা স্বাধীন হবে, সেইজন্যে এই গানটার জন্যে আমাদের মতো মানুষের অন্য রকম একটা মায়া।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, "মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দেশে কী হয়েছিল তোমরা জানো?"

অনেকে বলল, "জানি।" কয়েকজন বলল, "না জানি না।" বাকিরা চুপ করে রইল। আমাদের পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের যে কথাবার্তা লেখা আছে তার অনেকগুলো নাকী ভুয়া। প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে সেটা জিজ্ঞেস করলে হতো কিন্তু আমি ক্লাসে কখনো কোন স্যার-ম্যাডামকে কিছু জিজ্ঞেস করি না। খারাপ ছেলে হিসেবে একবার পরিচয় হয়ে যাবার পর আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দেশে অনেক কিছু হয়েছিল, কিন্তু কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি হয়েছিল আমি কী বলব জানো?"

ক্লাসের প্রায় সবাই জিজ্ঞেস করল, "কী ম্যাডাম?"

"দুঃখ।" প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তখন এই দেশে এমন একটি পরিবার ছিল না যাদের কোন না কোন আপনজন মারা যায় নি। এই দেশের প্রত্যেকটা পরিবার, প্রত্যেকটা মানুষকে সেই মুক্তিযুদ্ধ স্পর্শ করেছিল।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ঘুরে ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি একজন মাকে জানি যার ছেলেকে পাকিস্তান মিলিটারিরা মেরে ফেলেছিল। সেই মা তারপর থেকে যতদিন বেঁচে ছিল কোন দিন ভাত খায় নি, মৃত্যুর আগে ছেলেটা ভাত খেতে চেয়েছিল, তার জন্যে রান্না করে তার মা ভাত পাঠিয়েছিলেন, সেই ছেলেটা সেই ভাত খেতে পারে নি, সেজন্যে।"

ঠিক কী কারণ জানি না আমার তখন হঠাৎ আমার নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। এখন যদি মুক্তিযুদ্ধের সময় হতো আর আমি যদি মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে পাকিস্তান মিলিটারির হাতে ধরা পড়ে যেতাম আর পাকিস্তান মিলিটারি যদি আমাকে টর্চার করতো সেই খবরটা শুনে আম্মু কী করতেন? খুশি হতেন?

বিষয়টা চিন্তা করতে করতে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। হঠাৎ শুনলাম জহুরুল দাঁড়িয়ে বলছে, "আমার বড় চাচা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন।" তারপর ইশতিয়াক দাঁড়াল, সে বলল, "আমাদের পাশের বাসায় একজন মুক্তিযোদ্ধা থাকেন।" নাঈমা বলল, "আমার আগের স্কুলের অঙ্ক স্যার মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম নিশ্চয়ই সবার কাছে জানতে চাইছেন ক্লাসের ছেলে মেয়েদের পরিচিত কেউ মুক্তিযোদ্ধা আছে কীনা। অনেকেই বলল, আমিও ভাবলাম আমিও বলি যে আমার আব্বু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু আমি কিছু বললাম না। কেউ প্রশ্ন না করলে নিজে থেকে কিছু বলার বিষয়টি আমি ভুলেই গিয়েছি।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে যারা বেঁচে আছে এখন যদি তাদের দেখো দেখবে তাদের চুল পেকে গেছে। তাদের বয়স হয়ে গেছে। কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় মারা গেছে তাদের কারো বয়স হয়নি, তাদের বয়সটা সতেরো আঠারো উনিশ বছরে আটকে গেছে। তারা আর কোন দিন বুড়ো হবে না, তারা অনন্তকাল কিশোর থাকবে। তরুণ থাকবে। কী আশ্চর্যের একটা ব্যাপার, তাই না?"

আমরা কেউই ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করি নাই। সত্যিই তো একজন মানুষ যখন কম বয়সে মারা যায় তখন তার তো আর বয়স বাড়ে না। সে তো সারাজীবনই কম বয়সী থেকে যায়! মানুষটি বেঁচে থাকে না কিন্তু তার স্মৃতিটা বেঁচে থাকে। কী সাধারণ একটা ব্যাপারকে ইচ্ছে করলেই কী অসাধারণ ভাবে দেখা যায়। আমি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে প্রিন্সিপাল ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেমন জানি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, মনে হতে লাগলো আমাদেরকে দেখেও দেখছেন না। মনে হতে লাগলো অনেক দূরে কোথাও তাকিয়ে আছেন। খানিকক্ষণ সেভাবে তাকিয়ে থেকে আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "তোমাদেরকে একজন মুক্তিযোদ্ধার গল্প বলি। সত্যি গল্প।

"একাত্তর সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন ছেলেটা পড়ে ক্লাস টেনে। স্কুলের ছাত্র, তোমাদের থেকে দুই এক বছর বেশি বয়স হবে। এত ছোট ছেলের তো যুদ্ধে যাবার কথা না কিন্তু তবু সে বাসা থেকে পালিয়ে চলে গেলো যুদ্ধে।

"তার একটি ছোট বোন ছিলো, পিঠাপিঠি ভাই-বোন তাই দুজনে শুধু ঝগড়া করতো। সত্যিকারের ঝগড়া না, পিঠাপিঠি ভাইবোনের ঝগড়া। কে মশারি টানাবে সেটা নিয়ে ঝগড়া। বইয়ের মলাট কে ছিঁড়ে ফেলল সেটা নিয়ে ঝগড়া, গল্প বই কে আগে পড়বে সেটা নিয়ে ঝগড়া।

"ভাইটি যে রাতে বাসা থেকে পালিয়ে যুদ্ধে চলে গেলো সেদিনও বোন তার সাথে ঝগড়া করেছিল, একেবারে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া। তার প্রিয় কলমের নিব ভোঁতা করে ফেলা নিয়ে ঝগড়া। বোনটা তো আর জানতো না যে তার ভাই সেই রাতে যুদ্ধে চলে যাবে, তাহলে নিশ্চয়ই সে রাতে আর ঝগড়া করতো না!

"যাই হোক, ছোট ছেলে অনেক কষ্ট করে বর্ডার পার হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়েছে। এত ছোট ছেলে, কেউ তাকে যুদ্ধে নিতে চায় না, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা দলে ঢুকে পড়ল। তাদের সাথে ট্রেনিং নিয়ে সে দেশের ভেতরে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে।

"আস্তে আস্তে দিন পার হতে থাকে। প্রথম দিকে মনে হচ্ছিল পাকিস্তান মিলিটারিদের বুঝি কেউ হারাতে পারবে না, কিন্তু যতই দিন যেতে শুরু করেছে ততই বোঝা যেতে শুরু করেছে এই দেশে তাদের দিন একেবারে হাতেগোনা। আগে যেখানে পাকিস্তান মিলিটারির ভয়ে কেউ ঘর থেকে বের হতো না, সেসব জায়গাতেও রাত্রি বেলা গেরিলা বাহিনী এসে আক্রমণ করে বসে।

"এ রকম সময় সেই ছেলেটা তার দলের সাথে কাছাকাছি একটা এলাকায় এসেছে। কয়েকটা গেরিলা অপারেশান করে দলটি যখন ফিরে যাবে তখন ছেলেটা তার দলের কমান্ডারের কাছে বলল সে এক রাতের জন্যে তার বাসায় গিয়ে মা আর বোনের সাথে দেখা করতে চায়। কমান্ডার প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না, শেষে ছোট ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মায়া হলো, তিনি অনুমতি দিলেন।

"গভীর রাতে ছেলেটা তার বাসায় এসেছে। দরজায় টুকটুক শব্দ করছে, ঘুম ভেঙে মা অবাক হয়ে ভাবলেন, এতো রাতে অসময়ে কে এসেছে? দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বললেন, "কে?"

"ছেলেটা ফিসফিস করে বলল, "আমি, মা।" মা দরজা খুলে ছেলেটাকে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে সে কী কান্না। শুধু শরীরে হাত বুলান আর ফিসফিস করে বলেন, "তোর শরীরে কোথাও গুলি লাগে নি? কোথাও গুলি লাগে নি?"

"ছেলেটা হাসে আর বলে, "মা, গুলি লাগলে আমি তোমার কাছে এলাম কেমন করে?"

"এতো রাতে কথাবার্তা শুনে বোনটিও জেগে উঠেছে। ভাইকে দেখে কী অবাক। তার এইটুকুন ভাই, এখন তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া উষ্কখুষ্ক চুল, রোদে পোড়া চেহারা, পিঠে ছোট স্টেনগান, একেবারে সত্যিকারের যোদ্ধা! ভাই বোনকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কী এখনো আমার ওপর রাগ করে আছিস? দেশ স্বাধীন হোক তখন আমি তোকে এক ডজন কলম কিনে দেব!"

"তার কথা শুনে বোনটি ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। ভাইটি তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বলল, "ধুর বোকা মেয়ে কাঁদিস না। দেখিস, দেখতে দেখতে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে– পাকিস্তানিরা পালিয়ে যাবার জায়গা পাবে না।" বোনটা তখন লাজুক মুখে বলল, "ভাইয়া আমি আমার সোনার বাংলা গানটা তুলতে পারি– হারমোনিয়ামে তোমাকে বাজিয়ে শোনাব?" ভাইটি বলল, "এতো রাতে সেটা বাজালে আশেপাশে সন্দেহ করতে পারে– যখন দেশ স্বাধীন হবে তখন তুই বাজিয়ে শোনাবি। ঠিক আছে?"

"এদিকে মা দৌড়াদৌড়ি করে রান্না বসিয়েছেন। ছেলের জন্যে গরম ভাত আর শিং মাছের ঝোল। ছেলের খুব প্রিয় খাবার শিং মাছ। রান্না যখন শেষের দিকে তখন হঠাৎ বাসার চারপাশে ধুপধাপ শব্দ, মানুষজন দৌড়াদৌড়ি করছে। ছেলেটি হাতের স্টেনগান হাতে নিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "মা, আমাকে যেতে হবে।"

"মা ভয় পাওয়া গলায় বললেন, "কেন বাবা কী হয়েছে?"

"ছেলে বলল, "রাজাকাররা বাসা ঘিরে ফেলেছে। আমাকে যদি বাসার ভেতরে পায় তোমাদের খুব বড় বিপদ হবে মা।" মা ফিসফিস করে খোদাকে ডেকে বললেন, "ইয়া মাবুদ ইয়া পরওয়ার দিগার, আমার ছেলেকে তোমার হাতে দিলাম, তুমি তাকে রক্ষা করো–"

"ছেলে মাকে কদমবুসি করে বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে স্টেনগান হাতে রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।

"প্রথমে কোন শব্দ নেই, তারপর হঠাৎ কয়েকজন মানুষের চিৎকার শোনা গেলো তারপর গুলির শব্দ। রাইফেল আর স্টেনগানের গুলি তারপর কোন শব্দ নেই। মা আর বোন জানালার পর্দা তুলে বাইরে তাকাল, দেখলো রাস্তার মাঝখানে কে যেন পড়ে আছে।

"কিছু বোঝার আগে ছোট বোনটি দরজা খুলে অন্ধকারে ছুটে গেলো, গিয়ে দেখলো রাস্তার মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে তার ভাই। বোনটি খুব ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ভাইটির মাথাটি বুকে তুলে নিয়ে ফিসফিস করে ডাকল, "ভাই।"

"ভাইটি তখন চোখ খুলে তাকালো। রাত্রের আবছা অন্ধকারে দুই ভাই-বোন তখন একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে রইল। ভাইটি তখন ফিসফিস করে কিছু একটা বলল, বোনটি শুনতে পেলো না। তাই সে মাথাটা আরো নিচু করে নিলো, শুনলো ভাই ফিসফিস করে বলছে, "তুই আমাকে সোনার বাংলা গানটা শুনাবি?"

"বোন তখন তার চোখ মুছে তার ভাইয়ের মাথাটা কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে আমার সোনার বাংলা গানটি গাইতে লাগলো। আস্তে আস্তে চারিদিক থেকে রাজাকাররা তাকে ঘিরে ফেলছিল কিন্তু সে তবু গানটি বন্ধ করল না। বোনটি গাইতেই লাগলো– গাইতেই লাগলো!"

প্রিন্সিপাল ম্যাডামের গলা ধরে এলো। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "মেয়েটির যখন গানটি শেষ হয়েছে তখন তার ভাইটি আর বেঁচে নেই। রাজাকাররা তাদের দুজনকে ঘিরে রেখেছিল কিন্তু কাছে আসতে সাহস পাচ্ছিল না। বোনটি তার ভাইয়ের মাথাটা কোলে নিয়ে বসেই রইল। বসেই রইল।"

আমাদের কেউ বলে দেয় নি কিন্তু আমরা সবাই জানি সেই বোনটি হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম। আমরা তার দিকে তাকিয়ে সেই ছোট মেয়েটিকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

চোর

বাসা থেকে পালিয়ে যাওয়াটা আরও কয়েকদিনের জন্যে পিছিয়ে দিতে হলো। স্কুল থেকে আমাকে টি.সি. দিয়ে বের করে দেয়া হবে না সেটা আমি বুঝে গেছি। সেদিন যখন স্কুল ছুটি হবার পর বাসায় ফিরে যাচ্ছি তখন প্রিয়াংকা আমার কাছে ছুটে এসে বলল, "তপু।"

আমি বললাম, "কী?"

"তুই দেখলি কী হলো?"

অনেক দিন পর কেউ একজন আমার সাথে তুই তুই করে কথা বলল। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম একজন যখন আরেকজনের সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলে তখন কেমন লাগে। আমি আমার অবাক হওয়াটা গোপন রেখে বললাম, "কেন কী হয়েছে?"

"তুই প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে কী বলেছিলি মনে আছে?"

"কী?"

"রাজাকার স্যার রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ান না, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে টিটকারি মারেন—"

আমার মনে পড়ল, বললাম, "ও, হ্যাঁ মনে আছে।"

"প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ঠিক এগুলি নিয়ে কথা বলেছেন। রাজাকার স্যার দশ বছর ধরে যে সর্বনাশ করার চেষ্টা করেছেন প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এক ঘণ্টায় সেটা ঠিক করে দিলেন।" প্রিয়াংকা আনন্দে দাঁত বের করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

আমার দিকে তাকিয়ে অনেকদিন কেউ হাসে নি, আমার কাছে বিষয়টা এমন বিচিত্র মনে হলো যে আমি ভ্যাবাচেকা খেয়ে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রিয়াংকা বললাম, "তোর কী হলো? এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন?"

আমি বলল, "না কিছু হয় নাই।"

প্রিয়াংকা বলল, "প্রিন্সিপাল ম্যাডামের জন্যে কিছু একটা করতে হবে।"

আমি বললাম, "কী করবে?" বলতে চেয়েছিলাম "কী করবি?" কিন্তু বলতে পারলাম না। কীভাবে কীভাবে জানি নিজের চারিদিকে একটা দেওয়াল তুলে ফেলেছি, কারো সাথে সহজ হতে পারি না।

প্রিয়াংকা বলল, "এখনও ঠিক করি নাই। চিন্তা করছি।"

প্রিয়াংকা মনে হয় চিন্তা করতে করতেই ব্যাগ ঝুলিয়ে চলে গেলো। আমিও স্কুল থেকে বের হয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম। অন্ধকার হবার আগে আমি কখনো বাসায় ফিরে যাই না।

সেদিন রাত্রিবেলা আমি একটা বিচিত্র কাজ করলাম। স্টোররুমে আমার বিছানায় গুটিশুটি মেরে বসে আমাদের বাংলা বইয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাটা মুখস্থ করে ফেললাম। মোটামুটি বড় কবিতা কিন্তু দেখতে দেখতে মুখস্থ হয়ে গেলো। আমি যখন মনে মনে কবিতাটা আবৃত্তি করছি ঠিক তখন নেংটি ইঁদুরটা দরজার চৌকাঠের অন্যপাশ থেকে আমার দিকে উঁকি দিল। আমি মেঝেতে আঙুল দিয়ে ঠোকা দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "এই মিচকি! এই!"

নেংটি ইঁদুরটা আমার দিকে এগিয়ে এলো, আমি আমার পকেট থেকে ছোট ছোট রুটির টুকরো বের করে কাছাকাছি ছড়িয়ে দিলাম। নেংটি ইঁদুরটা একটু দূর থেকে সাবধানে আমাকে লক্ষ্য করে আস্তে আস্তে কাছে এসে একটা রুটির টুকরো সাবধানে সরিয়ে নিয়ে কুটুর কুটুর করে খেতে থাকে। আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, "এই মিচকি? তোর কী কবিতা ভাল লাগে?"

নেংটি ইঁদুরটা আমার কথার উত্তর না দিয়ে তার দ্বিতীয় টুকরোটার জন্যে এগিয়ে এলো। আমি ফিসফিস করে বললাম, "শুনবি কবিতাটা?" নেংটি ইঁদুরটা তার মাথা তুলে সাবধানে আমার দিকে তাকালো, আমি সেটাকেই সম্মতির চিহ্ন হিসেবে ধরে নিয়ে বললাম, "তাহলে শোন।"

আমি তারপর ফিসফিস করে কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনাতে থাকি। ডাইনিংরুমে তখন আম্মু আপু আর ভাইয়াকে নিয়ে খাচ্ছে। দুলি খালা টেবিলে খাবার নিয়ে যাচ্ছে, ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের করছে। আমি সবকিছুকে ভুলে গিয়ে আমার নেংটি ইঁদুরকে ফিসফিস করে কবিতা শোনাতে লাগলাম। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে দেখলে খুব অবাক হতেন নিশ্চয়ই!

নেংটি ইঁদুরটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমি আমার হাতের তালুতে তুলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু সে রাজি হলো না। হাতের আঙুলগুলোর কাছাকাছি এসে সাবধানে গন্ধ শুঁকে এমন একটা ভাব করলো যে তার গন্ধটা পছন্দ হয় নি,

তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেলো। এই নেংটি ইঁদুরের সময়ের জ্ঞান খুব বেশি, তার হাবভাব দেখেই মনে হচ্ছে কোথাও একটা জরুরি এপয়েন্টমেন্ট আছে, তাকে এখনই চলে যেতে হবে!

নেংটি ইঁদুরটা চলে যাবার পর আমি কিছু করার নেই বলে আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এখন মে মাস, ভ্যাপসা গরম। এই স্টোররুমের বিছানায় শুয়ে আমি এপাশ-ওপাশ করতে থাকি। আমার যখন ঘুম আসে না তখন আমি মাথার ভেতরে কোন একটা অঙ্ক করার চেষ্টা করি, তখন সময়টা বেশ কেটে যায়। ঘড়িতে ঠিক তখন সাড়ে দশটা বাজার একটা ঘণ্টা বাজলো তখন আমি চিন্তা করতে লাগলাম কতক্ষণ পর পর ঘড়ির ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটা ঠিক এক জায়গায় এসে হাজির হয়। ঘণ্টার কাঁটা প্রতি মিনিটে আধা ডিগ্রি যায় মিনিটের কাটা যায় ছয় ডিগ্রি। প্রথমবার ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটা এক জায়গায় থাকে ঠিক বারোটার সময়। এর পরের বার ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটা এক জায়গায় আসবে একটা বেজে সাড়ে পাঁচ মিনিটের দিকে। মিনিটের সঠিক সংখ্যাটা হচ্ছে ত্রিশকে সাড়ে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেটা। প্রতি ঘণ্টার পর এই সংখ্যার সমান সংখ্যক মিনিট সরে যেতে হবে– সমস্যাটা আসলে একেবারে কঠিন না। একেবারে পানির মতো সোজা। সময় কাটানোর জন্যে আমার আরো কঠিন একটা সমস্যা দরকার।

একটা সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর মাঝখানে যদি বাহুর তিন ভাগের এক ভাগ সমান একটা ত্রিভুজ বসানো হয় তাহলে কেমন হয়? সেই ত্রিভুজের মাঝখানে আরেকটা ছোট ত্রিভুজ, তার মাঝখানে আরেকটা এভাবে যদি বসানোই হতে থাকে তাহলে যে জিনিসটা তৈরি হবে তার পরিসীমা কতো? তার ক্ষেত্রফলইবা কতো? কিছুক্ষণের মাঝেই সমস্যাটা আমি মাথার মাঝে করে ফেললাম কিন্তু যে উত্তরটা পেলাম সেটা হলো খুব অদ্ভুত। ক্ষেত্রফল সসীম কিন্তু পরিসীমা অসীম। কী আশ্চর্য!

আমি বিছানা থেকে উঠে বসলাম, এটা একটা ভাল সমস্যা। এর পিছনে কিছুক্ষণ সময় কাটানো যায়। সমস্যাটা মাথার মাঝে করে ফেলা গেছে কিন্তু এটা সত্যি কীনা বোঝার জন্যে কাগজ-কলম লাগবে। আমি উঠে বসে আমার একটা খাতা আর কলম নিয়ে হিসেব করতে লাগলাম। ঠিক যখন মাঝামাঝি এসেছি আর দুটি লাইন করলেই পরিসীমাটি পেয়ে যাই তখন আমার বল পয়েন্ট কলমের কালিটা শেষ হয়ে গেল! আমার এতো মেজাজ খারাপ হলো যে বলার মতো নয়– ইচ্ছে হলো কলমটাকে কামড়ে খেয়ে ফেলি! কিন্তু বল পয়েন্ট কলম কামড়ে খেয়ে ফেললেও তো সেটা থেকে লেখা বের হবে না!

আমি আমার কাগজগুলো নিয়ে ছটফট করতে লাগলাম, সমস্যাটা শেষ করার জন্যে হাত নিশপিশ করতে লাগলো। ভাইয়া কিংবা আপুর কাছ থেকে একটা কলম চেয়ে আনা যায়, কিন্তু আম্মুর চোখে পড়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে! সরাই ঘুমিয়ে যাবার পর খুব সাবধানে উঠে গিয়ে ভাইয়া কিংবা আপুর টেবিল থেকে একটা কলম নিয়ে আসা ছাড়া আর কোন সহজ উপায় নেই। তা না হলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বাসা থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে অনেকদিন থেকে আমি একটু একটু করে টাকা-পয়সা জমানোর চেষ্টা করছি, সেখান থেকে দুটো টাকা নিয়ে একটা বল পয়েন্ট কলম কিনে ফেলা যাবে। কিন্তু এখন রাত সাড়ে দশটা-এগারোটার সময় আমার কিছুই করার নেই।

সবকিছু ভুলে গিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করা যায় কিন্তু আমি ঘুমাতে পারছি না। দেখাই যাচ্ছে আমি যে জিনিসটার পরিসীমা আর ক্ষেত্রফল বের করার চেষ্টা করছি তার মাঝে একটা বিচিত্র ব্যাপার রয়েছে। এর ক্ষেত্রফল অসীম কিন্তু পরিসীমা সসীম। এটা কীভাবে হতে পারে?

বিষয়টা ভাল করে দেখার জন্যে আমার ভেতরটা আঁকুপাকু করতে লাগলো। আমার দরকার একটা কলম বা পেন্সিল! আমি আমার বিছানা কাগজপত্র ভাল করে উল্টেপাল্টে দেখলাম, কোথাও আরেকটা কলম কিংবা পেন্সিল নাই। বহুদিন থেকে লেখাপড়া করি না, তাই থাকার কথাও না। কী করব বুঝতে না পেরে শুয়ে শুয়ে আমি ছটফট করতে লাগলাম।

রাত সাড়ে এগারোটার দিকে বাসার সব আলো নিভে গেল, তার মানে সবাই শুয়ে পড়েছে। তারপর আমি আরো কিছুক্ষণ সময় দিলাম, যখন মনে হলো সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন আমি সাবধানে আমার বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে ভাইয়ার ঘরের সামনে হাজির হলাম। খুব সাবধানে দরজাটা একটু খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলাম। ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার, কোন কিছু দেখা যায় না। বাম পাশে বিছানায় ভাইয়া ঘুমাচ্ছে, পাশে টেবিলে তার বই খাতাপত্র। টেবিলের উপরে নিশ্চয়ই কলম পেন্সিল ছড়ানো থাকবে সেখান থেকে হাতড়ে একটা কলম খুঁজে নিতে হবে। আমি টেবিলের উপর হাত দিলাম, বই, কিছু কাগজ, গানের সিডি এরকম জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিন্তু কোন কলম বা পেন্সিল নেই। আমি দুই পাশে হাত বুলাতে থাকি, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না হঠাৎ করে হাত লেগে কিছু একটা পড়ে গেলো, টেবিল থেকে গড়িয়ে সেটা মেঝেতে পড়ে সশব্দে ভেঙ্গে যায়।

আমার হৃৎপিণ্ড হঠাৎ করে যেন থেমে গেলো। বিছানায় লাফ দিয়ে ভাইয়া উঠে বসেছে, ভয় পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠেছে, "কে?"

আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। উপায় না দেখে ফিসফিস করে কাতর গলায় বললাম, "ভাইয়া, আমি তপু।"

ভাইয়া অবাক হয়ে বলল, "তপু!"

ততক্ষণে সর্বনাশ যেটা হবার সেটা হয়ে গেছে, পাশের ঘর থেকে আম্মু জিজ্ঞেস করেছেন, "রাজীব, কী হয়েছে?"

ভাইয়া বলল, "কিছু না আম্মু।"

"কার সাথে কথা বলিস?"

ভাইয়া ইতস্তত করে বলল, "তপুর সাথে।"

পাশের ঘরে আম্মু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর আমি শুনতে পেলাম বিছানা থেকে নামছেন। আলো জ্বালালেন তারপর দরজা খুলে ভাইয়ার ঘরে এসে ঢুকলেন। ভাইয়ার ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালালেন। তীব্র আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। স্টোররুমে হঠাৎ করে আলো জ্বালালে তেলাপোকাগুলো যেমন কোথায় গিয়ে পালাবে বুঝতে পারে না, আমার অবস্থা হলো ঠিক সেরকম। আম্মুর সামনে আমি জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, নিজেকে নিয়ে কোথায় লুকাবো আমি বুঝতে পারছিলাম না। এক পলকের জন্যে আম্মুর দিকে তাকিয়ে আমি মাথা নিচু করে দাড়িয়ে রইলাম, আম্মুর চোখ ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে।

আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "তুই এখানে কী করছিস?"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। কিছু না বলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকাই মনে হয় সবচেয়ে নিরাপদ।

আম্মু আরও এক পা এগিয়ে এসে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন এসেছিস এখানে?" আম্মু নিচের দিকে তাকালেন, আমার হাতে লেগে টেবিলে রাখা গ্লাসটা পড়ে ভেঙ্গে গেছে। শুধু যে গ্লাসটা ভেঙ্গেছে তা নয়, পানি পড়ে টেবিলে রাখা ভাইয়ার বই-কাগজপত্রও একটু ভিজে গেছে।

আম্মু আরও এক পা এগিয়ে এসে খপ করে আমার চুল ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিলেন, হিংস্র গলায় বললেন, "কী করতে এসেছিস এই ঘরে?"

আমি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বললাম, "একটা কলম নিতে এসেছিলাম।"

আম্মু আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন, "কলম নিতে এসেছিস? কলম?"

আমি মাথা নাড়লাম। আম্মু গলায় বিষ ঢেলে বললেন, "আমার জ্ঞানের সাগর আইনস্টাইন রাত দুপুরে এসেছেন কলম চুরি করতে! আমার সাথে তুই ইয়ারকি মারতে এসেছিস? তুই ভাবছিস আমি জানি না তোর পড়াশোনার নমুনা? তুই কয় সাবজেক্টে পাস করিস আর কয় সাবজেক্টে ফেল করিস আমি সেটা জানি না ভেবেছিস?"

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আম্মু এদিক সেদিক তাকিয়ে চেয়ারে রাখা ভাইয়ার প্যান্ট থেকে তার বেল্টটা খুলে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। চিৎকার করে বললেন, "সত্যি করে বল কেন এসেছিস? কী চুরি করতে এসেছিস?"

কথা শেষ করার আগেই বেল্টটা দিয়ে আম্মু সমস্ত শরীরের শক্তি দিয়ে আমাকে মারলেন, মনে হলো আমার চামড়া কেটে বেল্টটা শরীরের ভেতর ঢুকে গেলো। যন্ত্রনায় আমি নিজের অজান্তেই কেঁদে উঠলাম।

আমাকে কাঁদতে দেখে আম্মু মনে হয় আরো খেপে উঠলেন, বেল্টটা দিয়ে আমাকে নির্মমভাবে আরো কয়েকবার মেরে বললেন, "বল তুই কী করতে এসেছিস? বল জানোয়ারের বাচ্চা জানোয়ার।"

আমার কান্না আর আম্মুর চিৎকার শুনে ভাইয়া তার বিছানা থেকে নেমে এসেছে, আপুও তার ঘর থেকে চলে এসেছে। দুলি খালাও বের হয়ে এসেছেন। সবাই নিঃশব্দে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, কেউ আমাকে বাঁচাতে এলো না। গরমের জন্যে আমার খালি গা, ময়লা খাটো একটা পায়জামা পরে আছি, ঠিকমতো গোসল করতে পারি না বলে গায়ে ময়লা, একমাথা ময়লা চুলে আমাকে নিশ্চয়ই দেখাচ্ছে হতচ্ছাড়া একজন মানুষের মতো। আমি জানি আমাকে দেখে কারো ভেতরে কোন মায়া হচ্ছে না, কোন করুণা হচ্ছে না– সবার ভিতরে এক ধরনের বিতৃষ্ণা হচ্ছে, ঘেন্না হচ্ছে। একটা ঘেয়ো কুকুরকে যখন কেউ লাথি মারে, সেটা কেঁউ কেঁউ শব্দ করে পালিয়ে যায়, তখন সেই কুকুরটার জন্যে যেরকম মায়া হয় না, ঠিক সেরকম আমার জন্যেও কারো মায়া হচ্ছে না। আমার নিজেকে এতো ছোট, এতো জঘন্য মনে হতে লাগলো যে ইচ্ছে হলো মাটির তলায় ঢুকে যাই।

এক সময় আপু এগিয়ে এসে শুকনো গলা বলল, "আম্মু তপু হয়তো আসলেই একটা কলমের জন্যে এসেছে। একটা কলম দিয়ে দাও। তারপর শুতে চলো। এতো চেঁচামেচি করলে তোমার শরীর খারাপ করবে।"

আম্মু চিৎকার করে বললেন, "তুই এই বদমাইশটার কথা বিশ্বাস করছিস? তুই জানিস এই বদমাইশটা একটা চোর? চুরি করতে এসেছে–"

আপু বলল, "থাকুক আম্মু–"

আম্মু বললেন, "কেন থাকবে? একটা চোরকে আমি বাসায় পালব?"

আপু কী বলবে বুঝতে পারল না, ঘুম ঘুম চোখে একটা হাই তুলে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল। আম্মু বললেন, "আমি লিখে দিতে পারি এই বদমাইশটার ঘর সার্চ করলে বের হবে এটা কী কী জিনিস চুরি করে–"

আপু আবার বলল, “থাকুক আম্মু।”

আম্মু বললেন, “তুই আমার কথা বিশ্বাস করলি না? আয় আমার সাথে।” তারপর আমার চুল ধরে হিড়হিড় করে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন আমার স্টোর রুমে। আমার ময়লা তোষকটা তার হাত দিয়ে ধরতে ঘেন্না হলো তাই পা দিয়ে সেটা ওল্টাতে শুরু করলেন। পালিয়ে যাবার জন্যে আমি অনেক দিন থেকে টাকা জমিয়ে যাচ্ছি– সত্যি কথা বলতে কী তার অনেকটুকু আমি আসলেই চুরি করেছি। কেউ যেন বুঝতে না পারে সেভাবে, অল্প অল্প করে। কখনো ভাইয়ার পকেট থেকে, কখনো আপুর ব্যাগ থেকে। বাসায় যখন কেউ নেই তখন ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে। এই সবগুলো টাকা আমি ঘরের কাগজে মুড়ে বিছানার নিচে লুকিয়ে রেখেছি, আম্মু পা দিয়ে সেটা বের করে ফেললেন। সাথে সাথে তার সারা মুখ আনন্দে চকচক করতে থাকে, ভাইয়া আর আপুকে ডেকে বললেন, “দেখলি? দেখলি তোরা? আমি বলেছিলাম না এ চোর? দেখেছিস?”

আপু আর ভাইয়া একবার টাকাগুলি দেখলো তারপর আমার দিকে তাকালো। আপু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “ছিঃ! তপু। ছিঃ!” আপুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো আমি যেন এখনি মরে যাই।

আম্মু টাকাগুলো হাতে তুলে নিলেন, তারপর বেল্টটা হাতে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি আম্মুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু দেখতে পেলাম। আম্মু যখন আমার আমাকে মারতে শুরু করলেন আমি বৃথাই আমার হাত দিয়ে আমার মুখটা বাঁচাতে চেষ্টা করলাম।

দুলি খালা শেষ পর্যন্ত যদি আমাকে সরিয়ে না নিতেন তাহলে আম্মু মনে হয় সত্যিই শেষ পর্যন্ত আমাকে মেরে ফেলতেন। আমি প্রথমে কিছুক্ষণ চিৎকার করেছি, কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই আমি আর চিৎকার করতে পারছিলাম না। আমি মেঝেতে পড়ে গেলাম, গলা দিয়ে গোঙ্গানোর মতো এক ধরনের শব্দ বের হতে লাগলো। আপু আর ভাইয়া অনেকবার এই দৃশ্য দেখেছে তারা কাছাকাছি বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু দুলি খালা একসময় আর সহ্য করতে পারল না, আম্মুকে ঠেলে একরকম জোর করে আমাকে সরিয়ে নিল।

পরদিন আমার সারা শরীর ফুলে গেলো। জায়গায় জায়গায় রক্ত নীল হয়ে জমে আছে। তার সাথে গা কাঁপিয়ে জ্বর। আমি আমার ময়লা তোষকের উপর

গুটিশুটি মেরে শুয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। জ্বরের ঘোরে আমি বিচিত্র সব জিনিস স্বপ্নে দেখতে লাগলাম, কখনো দেখলাম আম্মু একটা বিশাল কিরিচ নিয়ে আমার দিকে ছুটে আসছেন, আম্মুর চুলে আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে আর আম্মু হা হা করে হাসছেন, তার মুখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। কখনো দেখলাম পাগলা কুকুর আমার ওপর ঝাপিয়ে পড়ছে, আঁচড়ে-কামড়ে আমাকে ছিঁড়ে ফেলছে। আবার কখনো দেখলাম একটা বড় ত্রিভুজকে ঘিরে অনেকগুলো ছোট ত্রিভুজ, তাদের ঘিরে আরো অনেকগুলো ছোট ত্রিভুজ। সেগুলো কখনো বড় হচ্ছে কখনো ছোট হচ্ছে কখনো ঘুরছে কখনো নড়ছে, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি এই ক্ষেত্রটির পরিসীমা বের করতে। পারছি না, আর পারছি না বলে যন্ত্রণায় ছটফট করছি।

জ্বরের ঘোর থেকে মাঝে মাঝে আমি জেগে উঠেছি, জেগে উঠে আমি দেখেছি স্টোররুমের অন্ধকার কোনায় আমি শুয়ে আছি। আমার বুকটা খাঁ খাঁ করছিলো একটুখানি স্নেহের কথার জন্যে একটুখানি মমতার কথার জন্যে। শুধু মনে হচ্ছিল, আহা, কেউ যদি আমার কপালে হাত রেখে বলতো, "তপু, এখন কেমন লাগছে তোমার?" কিন্তু কেউ আমাকে সেটা বলল না, আমি একা একা শুয়ে রইলাম।

কেউ যে আমার কাছে এলো না সেটা সত্যি না। আমি যখন রাত্রিবেলা জ্বরের ঘোরে আধা অচেতন হয়ে পড়েছিলাম তখন হঠাৎ করে আমার হাতের মাঝে একটু সুড়সুড়ি অনুভব করলাম। চোখ খুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম নেংটি ইঁদুরটা আমার হাতটা শুঁকে সেখানে উঠে বসেছে। এক ধরনের কৌতূহল নিয়ে সে আমার দিকে তাকাচ্ছে! প্রতিরাত আমি তার জন্যে রুটির টুকরো এনে রেখেছি, আজ কিছু নেই– নেংটি ইঁদুরটা মনে হয় সেটা বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি চোখ খুলে ফিসফিস করে বললাম, "মিচকি? তুই এসেছিস?"

আমার স্পষ্ট মনে হলো নেংটি ইঁদুরটা মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "তোর জন্যে কোন খাবার আনতে পারি নি রে মিচকি! সরি। দেখছিস না আমার অবস্থা? আমার আম্মু মেরে আমাকে একেবারে ভর্তা বানিয়ে দিয়েছে।"

আমার মনে হলো নেংটি ইঁদুরটা আমার কথা বুঝতে পারল। সেটা সম্মতির ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "আজকে তুই নিজে নিজে কষ্ট করে কিছু একটা খেয়ে নে। কাল তোর জন্যে খাবার আনব। ঠিক আছে?"

জ্বরের ঘোরে সবকিছু ওলটপালট হয়ে আছে, তাই আমার মনে হলো নেংটি ইঁদুরটা মাথা নাড়ল। আমি তখন অন্য হাত দিয়ে খুব আস্তে করে তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিলাম, আর কী আশ্চর্য সেটা অন্যদিনের মতো

লাফিয়ে সরে গেলো না। আমি হাতটা নিচে রাখলাম তখন নেংটি ইঁদুরটা হাত থেকে নেমে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল।

* * *

আমি স্কুলে গেলাম দুইদিন পর। সারা শরীরে আম্মুর বেল্ট দিয়ে মারের চিহ্ন, সেগুলো আমি শার্ট দিয়ে ঢেকে রেখেছি। শুধু বাম গাল থেকে গলা পর্যন্ত একটা দাগ ঢেকে রাখা যায় নি। সেটা নিয়ে আমি অবশ্যি খুব বেশি ভাবছি না। আমার আম্মু যে আমাকে এভাবে মারেন সেটা কেউ জানে না। সবাই ধরে নেয় আমি পথেঘাটে মারামারি করে নিজের এ অবস্থা করি।

স্কুলে আমাকে দেখে সবাই সরে গিয়ে জায়গা করে দিলো। আমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলো না, শুধু প্রিয়াংকা চোখ কপালে তুলে বললো, "সে কী, তোর গালে কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "কিছু না।"

আমি বলতে চাইছি না দেখে প্রিয়াংকা আর কিছু জানতে চাইল না। বলল, "তুই দুইদিন স্কুলে আসিস নি কেন?"

আমি একটু অবাক হয়ে প্রিয়াংকার দিকে তাকালাম, আমি স্কুলে এসেছি কী আসি নাই কেউ সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে সেটা আমার বিশ্বাস হয় না। আমি আমতা আমতা করে বললাম, "শরীর খারাপ ছিল।"

"ও।" প্রিয়াংকা হড়বড় করে বলল, "তুই যা একটা ফাটাফাটি জিনিস মিস করেছিস!"

"কী জিনিস?"

"প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কালকে আবার ক্লাসে এসেছিলেন।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।" প্রিয়াংকা রহস্য করে বলল, "বল দেখি কী নিয়ে কথা বলেছেন?"

"মুক্তিযুদ্ধ?"

"উঁহুঁ।" প্রিয়াংকা দাঁত বের করে হেসে বলল, "হিন্দু-মুসলমান নিয়ে। এতো সুন্দর করে বলেছেন যে তুই শুনলে বেকুব হয়ে যেতি।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কী বলেছেন?"

"আমি কী আর ম্যাডামের মতো বলতে পারব?" প্রিয়াংকা গম্ভীর হয়ে বলল, "বলেছেন যে পৃথিবীটা সুন্দর তার বৈচিত্র্যের জন্যে। তাই যেখানে

বৈচিত্র্য বেশি সেখানে সৌন্দর্য বেশি। যেখানে কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান কেউ বৌদ্ধ কেউ খ্রিস্টান এবং বাঙালি কেউ পাহাড়ি কেউ চাকমা কেউ সাঁওতাল এবং সবাই যখন মিলেমিশে থাকে আর একজন আরেকজনের বৈচিত্রটাকে উপভোগ করে সেটাই সবচেয়ে সুন্দর।"

আমি বললাম, "ও।"

প্রিয়াংকা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি ঠিক করে বলতে পারলাম না তাই তুই বলছিস 'ও'! যদি ম্যাডামের কথা শুনতি তাহলে তোর চোখ ভিজে আসত।"

আমি আবার বললাম, "ও।"

প্রিয়াংকা এবারে তার মুখটা আমার কাছাকাছি এসে ষড়যন্ত্রীর মতো করে বলল, "প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কেন হিন্দু-মুসলমান নিয়ে কথা বলছেন, বল দেখি?"

আমি বললাম, "কেন?"

"তোর জন্যে! তুই যে রাজাকার স্যারের কথা বলে দিয়েছিলি মনে আছে? ক্লাসে হিন্দু ছেলেমেয়েদের পেটাতেন-"

আমি বললাম, "ও।"

প্রিয়াংকা বিরক্ত হয়ে বলল, তোর হয়েছেটা কী? তোকে যেটাই বলি তুই বলিস, ও!"

আমি একটু লজ্জা পেলাম, বললাম, "না মানে ইয়ে-"

"তুই কী অন্য কিছু ভাবছিস?"

আমি আসলে অন্য কিছু ভাবছিলাম না, প্রিয়াংকা কী বলছে সেটাই খুব মন দিয়ে শুনছিলাম, কিন্তু আমার সমস্যা হলো মানুষের সাথে কতা না বলতে বলতে আমি আজকাল আর ঠিক করে কারো সাথে কথা বলতে পারি না। কেউ কিছু বললে তার উত্তরে "ও" "তাই নাকী" "আচ্ছা" এই রকম কথাবার্তা ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না। কিন্তু প্রিয়াংকাকে সেটা বলতে আমার লজ্জা করল, তাই বললাম, "হ্যাঁ আসলে একটা জিনিস ভাবছিলাম তো-"

"কী জিনিস?"

"মানে- ইয়ে একটা অঙ্ক।"

"অঙ্ক?" প্রিয়াংকা চোখ কপালে তুলে বলল, "কী রকম অঙ্ক?"

"ইয়ে একটা সমবাহু ত্রিভুজের তিন বাহুর মাঝখানে যদি আরো তিনটা ছোট সমবাহু ত্রিভুজ আঁকা যায়-" আমি প্রিয়াংকাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম সে ঠিক বুঝতে পারল বলে মনে হলো না। তখন খাতা বের করে পুরোটা এঁকে বললাম, "এই যে ক্ষেত্রটা দেখছ এটা খুব বিচিত্র খুব একটা ক্ষেত্র।"

"কেন?"

"আমি যদি তোমাকে বলি একটা কলম দিয়ে এর পরিসীমাটা আঁকো তুমি পারবে না। পৃথিবীর সমস্ত কলম দিয়ে আঁকার চেষ্টা করলেও পারবে না, কারণ এর পরিসীমা হচ্ছে অসীম! ইনফিনিটি!"

প্রিয়াংকা বলল, "তাই নাকী?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তোমাকে যদি বলি এর ভেতরের ক্ষেত্রফলটা রং করে দাও তাহলে তুমি একটা কলম দিয়ে ঘষে ঘষে রং করে ফেলতে পারবে! ক্ষেত্রফল হচ্ছে সসীম কিন্তু পরিধি হচ্ছে অসীম– কী অদ্ভুত দেখেছ?"

বিষয়টা যে খুব অদ্ভুত সেটা প্রিয়াংকা প্রথমে ঠিক বুঝতে পারে নি। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে তাকে বোঝাতে হলো। যখন সত্যি সত্যি বুঝতে পারল তখন সে এতো অবাক হলো বলার মতো নয়। একটু পরে পরে বলতে লাগলো, "এটা কেমন করে সম্ভব?" "এটা কেমন করে সম্ভব?"

আমি বললাম, "খুব সম্ভব। তুমি নিজেই দেখছ।"

প্রিয়াংকা খানিকক্ষণ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোর অঙ্ক করতে খুব ভাল লাগে?"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "তা তো জানি না।"

"তুই বড় হয়ে গণিতবিদ হবি?"

আমি হেসে ফেললাম, বললাম, "ধুর!"

প্রিয়াংকা ভাবল আমি বিনয় করছি, কিন্তু আমি যে দুই একদিনের মাঝে বাসা থেকে সারা জীবনের মতো পালিয়ে যাব কেউ আর আমার খোঁজ পাবে না সেটা আর বললাম না। বড় জোর একটা বেদে হয়ে পথেঘাটে সাপের খেলা দেখাব। আমার জীবনে এর থেকে বেশি আর কী হতে পারে? আমি জানি আমার কপালে এটা সিল মেরে লিখে দেওয়া আছে।

পলাতক

বাসা থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে অনেক কষ্টে একটু একটু করে টাকাগুলো জমিয়েছিলাম, আমার তোষকের তলায় সেগুলো পেয়ে আম্মু নিয়ে গেছেন। আম্মু ধরে নিয়েছেন সেগুলো আমি চুরি করে এনেছি আর সেদিন রাত্রে ভাইয়ার রুমেও গিয়েছিলাম চুরি করতে। আম্মুর সন্দেহ পুরোপুরি মিথ্যা না আর সেটা চিন্তা করে আমি নিজের ভিতরে নিজে কেমন যেন ছোট হয়ে গেছি। আমার মনটা আসলে ভেঙ্গে গেছে, সত্যি সত্যি আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে আমি আসলে খারাপ ছেলে, আমি চোর। শুধু যে নিজেকে চোর মনে হয় তা না আমি কেমন যেন ভীতু হয়ে গেছি। আম্মুর হাতে সেদিন ওরকম মার খেয়ে আমার ভিতরে কেমন যেন পরিবর্তন হয়ে গেছে। যতক্ষণ বাসায় থাকি স্টোররুমে গুটিশুটি মেরে বসে থাকি, বাসার ভিতরে কোথাও আম্মুর গলার স্বর শুনলেই কেমন জানি চমকে উঠি। বুকের ভেতর ধুকপুক শুরু হয়ে যায়।

বাসা থেকে বের হলে আমি খানিকটা সাহস পাই। স্কুলে এলে খুব খারাপ লাগে না। প্রিয়াংকা মেয়েটা অনেকটা ম্যাজিকের মতো - আমার মতো খারাপ ছেলের সাথেই সে কথাবার্তা বলে তাহলে অন্যদের সাথে তার কেমন বন্ধুত্ব হয়েছে সেটা আন্দাজ করা যায়। প্রিয়াংকার দেখাদেখি অনেক মেয়েই এখন সাহস করে ক্লাসের যেখানে ইচ্ছে সেখানে বসে যায়। মেয়েদেরকে সামনে বসতেই হবে সেই নিয়মটা আর নেই। রাজাকার স্যারের সেইটা নিয়ে মেজাজ খারাপ, কিন্তু কিছু বলতে পারেন না। আমি টি.সি. দিয়ে বিদায় করতে পারেন নাই সে জন্যে স্যার ভিতরে ভিতরে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেলেও কিছু করতে পারছেন না। স্যার বুঝে গেছেন প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমাদের পক্ষে।

প্রিয়াংকা মেয়েটা বেশ মজার, তার মাথার মাঝে একটা পাগলামোর ভাব আছে। সেদিন ক্লাসে এসে দেখি সে সবাইকে নিয়ে কী একটা 'ষড়যন্ত্র' করছে। ষড়যন্ত্রটা খুব মজার - আজকে নাকী শিউলির জন্মদিন, তাই যখন শিউলী ক্লাসে

আসবে তখন হঠাৎ করে সবাই একসাথে চিৎকার করে উঠবে, হ্যাপি বার্থডে! শুধু তাই না প্রিয়াংকা আর কয়েকজন মিলে মনে হয় শিউলির জন্যে গিফটও নিয়ে এসেছে! প্রিয়াংকা নিজে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, যখন দেখলো শিউলি আসছে তখন সে ভিতরে ছুটে এসে সবাইকে সাবধান করে দিলো। ক্লাসের সবাই যে যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়েই খুব স্বাভাবিক ভান করতে লাগলো। শিউলি কিছু জানে না, সে এসে তার ব্যাগ রেখে তার নিজের জায়গায় বসেছে। তখন কথা নাই বার্তা নেই হঠাৎ করে পুরো ক্লাসের সবাই মিলে বিকট সুরে চিৎকার করে উঠল, "হ্যা-পি-বা-র্থ-ডে-শি-উ-লি!"

শিউলি এমন ভাবে চমকে উঠল যে সেটা বলার মতো না! সবগুলি মেয়ে তখন নিজেরা হাত ধরাধরি করে শিউলিকে ঘিরে নাচতে লাগলো আর হ্যাপি বার্থডে গান গাইতে লাগলো! শিউলি চোখ বড় বড় করে সবার দিকে তাকিয়ে থাকে, লজ্জায় মনে হয় সে মরে যাচ্ছে, তার মুখের রঙ লাল নীল বেগুনি হতে থাকে! সবকিছু মিলে পুরো ব্যাপারটা ন্যাকামির চূড়ান্ত, কিন্তু ঠিক কী কারণ জানি না দেখে আমার ভালই লাগলো। শিউলি ক্লাসের সবচেয়ে লাজুক আর চুপচাপ মেয়ে, তার মনে হয় অনেকটা আমার মতো অবস্থা, বন্ধুবান্ধব বেশি নাই। তাকে নিয়ে এতো হৈচৈ সে নিজেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

গান গাওয়া শেষ হলে প্রিয়াংকা তার ব্যাগ খুলে শিউলির জন্যে একটা গিফটের প্যাকেট বের করলো। তার দেখা দেখি অন্যেরাও। কোনটাতে বই, কোনটাতে মাথার ক্লিপ, কোনটাতে কলম। কয়েকটা ছেলেও দেখি গিফট এনেছে, ছেলেরা মনে হয় গিফট কেনার ব্যাপারে বেশি সুবিধের না, চানাচুর না হয় চিপসের প্যাকেট কিনে এনেছে! শিউলি খুলে বের করা মাত্রই নিজেরাই কেড়ে নিয়ে খুলে সবাই মিলে খাওয়া শুরু করে দিল। আমি এসব হৈচৈ আনন্দ থেকে দূরে থাকি, আজকেও দূরে থেকে দেখলাম। দেখে ভালই লাগলো, মনে হলো সবাই মিলে খুব মজা করছে। প্রিয়াংকা মেয়েটা আসার আগে ছেলেরা আর মেয়েরা মিলে এক সাথে হৈচৈ করছে ব্যাপারটা চিন্তাই করা যেতো না।

বিকাল বেলা স্কুল থেকে বের হয়ে আসি হাঁটছি তখন হঠাৎ কোথা থেকে জানি প্রিয়াংকা ছুটে এসে আমার পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো। আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "তোর বাসা কী এদিকে?"

আমি "হ্যাঁ' "না" কিছু না বলে অস্পষ্ট একটা শব্দ করলাম। আমার বাসা কোথায় আমি সেটা কাউকে বলতে চাই না। স্কুল ছুটির পর আমি কোন দিনও বাসায় যাই না। রাস্তায় বের হয়ে ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করে যখন অন্ধকার হয়ে যায় তখন চোরের মতো বাসায় ফিরে যাই। প্রিয়াংকা কী বুঝলো কে জানে

নিজের মনে বকবক করতে লাগলো। আমি কোন কথা না বলে তার কথা শুনতে লাগলাম– মেয়েটা নিঃসন্দেহে একটা মজার মেয়ে, এমন সুন্দর করে কথা বলতে পারে যে শুনতে খুব মজা লাগে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে গেলো। আমি বললাম, "কী হয়েছে?"

প্রিয়াংকা ফিসফিস করে বলল, "ঐ দেখ।"

আমি প্রিয়াংকার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে এমন কিছু অস্বাভাবিক জিনিস দেখতে পেলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "কী দেখব?"

প্রিয়াংকা চাপা স্বরে বলল, "বাচ্চা মেয়েটাকে দেখছিস না?"

আমি তখন ধুলায় ধূসর চার-পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখতে পেলাম। রাস্তার ধুলোয় পা ছড়িয়ে বসে আপন মনে খেলছে। রুক্ষ লাল জটা বাঁধা চুল, ময়লা একটা ফ্রক পরে আছে। প্রিয়াংকা আবার গলা নামিয়ে বলল, "এই মেয়েটাকে খুঁজছি কয়দিন থেকে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন? এই মেয়ে কী করেছে?"

"কিছু করে নাই। মেয়েটার খুব শখ একটা লাল জামার।"

"তুমি কেমন করে জানো?"

"সেইদিন তার মায়ের সাথে বসেছিল তখন দেখেছে একটা ছোট মেয়ে লাল জামা পরে তার আম্মু-আব্বুর সাথে যাচ্ছে। তখন সে তার মাকে বলেছে, মা আমারে একটা লাল জামা কিনে দিবা? তার মা তখন কী করেছে জানিস?"

"কী করেছে?"

"ঠাস করে গালে একটা চড়। চড় দিয়ে বলে পেটের ক্ষিদায় জান বাঁচে না, লাল জামার শখ! মেয়ের শখ দেখো!"

আমি বললাম, "ও।"

প্রিয়াংকা বলল, "এত শক্ত একটা চড় খেয়েও কিন্তু মেয়েটা চোখের পানি ফেলে নাই। মায়ের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইল।"

আমি আবার বললাম, "ও!"

প্রিয়াংকা তার ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে বলল, "এই মেয়েটার জন্যে একটা লাল জামা কিনেছি। কয়দিন থেকে মেয়েটাকে খুঁজছি, আজকে পেয়ে গেলাম!"

আমি অবাক হয়ে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রিয়াংকা মুখ টিপে হেসে বলল, "প্যাকেটটা খুলে মেয়েটা যখন দেখবে ভিতরে একটা লাল জামা কী খুশি হবে চিন্তা করতে পারিস?"

মেয়েটা লাল জামাটা পেয়ে কতটুকু খুশি হবে জানি না, কিন্তু লাল জামার প্যাকেটটা দেয়ার জন্যে এই ছোট নোংরা বাচ্চাটাকে দেখে প্রিয়াংকা যে অসম্ভব খুশি হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রিয়াংকা প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বাচ্চাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকলো, "এই যে, শুনো–"

বাচ্চা মেয়েটা চোখ তুলে তাকালো, মনে হলো একটু ভয়ে ভয়ে।

প্রিয়াংকা বলল, "এই যে নাও। এইটা তোমার জন্যে।"

মেয়েটা একটু ভয়ে ভয়ে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে হঠাৎ বুকে চেপে ধরল, দেখে মনে হলো সে ভয় পাচ্ছে যে কেউ বুঝি তার কাছ থেকে এটা কেড়ে নেবে। প্রিয়াংকা তাকে অভয় দেবার জন্যে একটু হাসলো কিন্তু বাচ্চা মেয়েটা তারপরেও খুব অভয় পেলো বলে মনে হলো না। প্যাকেটটা বুকে চেপে ধরে রেখে বড় বড় চোখে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রিয়াংকা তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে টেনে বলল, "আয় যাই।"

আমি নিচু গলায় বললাম, "প্যাকেটটা খুলে কী করে দেখবে না?"

"নাহ্!"

"কেন?"

"আমি সেটা কল্পনা করে দেখে নেব। কল্পনা করে দেখতে আরো বেশি মজা!"

আমি প্রিয়াংকার সাথে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, "তুমি মাঝে মাঝেই এরকম করো?"

প্রিয়াংকা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। আমি এটাকে বলি 'বিক্ষিপ্ত ভাবে আনন্দ বিতরণ'। চিনি না জানি না সেরকম মানুষকে হঠাৎ করে কোনভাবে খুশি করে দেওয়া।"

ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অসাধারণ, আমার সুন্দর করে কিছু বলা উচিত ছিল, কিন্তু আমি বললাম, "ও।"

প্রিয়াংকা বলল, "তুই একটা জিনিস জানিস?"

"কী?"

"নিজেকে খুশি করা থেকে অন্যকে খুশি করার মাঝে অনেক বেশি আনন্দ!"

আমি বললাম, "ও!"

প্রিয়াংকা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোর সাথে কথা বলে কোন মজা নেই। তুই শুধু একটা শব্দ জানিস– সেটা হচ্ছে 'ও!'"

আমি বোকার মতো আবার বলে ফেললাম, "ও!"

আর সেটা শুনে প্রিয়াংকা হি হি করে হাসতে শুরু করল।

রাত্রিবেলা হঠাৎ খুব একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটলো, আমাকে আম্মু ডেকে পাঠালেন। আমার বুকটা আতংকে ধ্বক করে উঠল, একবার মনে হলো দরজা খুলে পালিয়ে যাই। অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে স্টোররুম থেকে বের হয়ে ডাইনিং রুমে এলাম। আম্মু ভাইয়া আর আপুকে নিয়ে খাচ্ছেন, টেবিলে দুলি খালা খাবার সাজিয়ে দিয়েছে। ইলিশ মাছের বড় বড় পেটি লাল করে ভাজা হয়েছে। একসময় আমার খুব প্রিয় খাবার ছিল ইলিশ মাছ, শেষবার কবে ইলিশ মাছ খেয়েছি মনে করতে পারলাম না। ভাতগুলো কী সুন্দর, চিকন এবং ধবধবে সাদা। ডাইনিং টেবিলে প্লেট-গ্লাসগুলো সুন্দর করে সাজানো, পাশে ন্যাপকিন ভাঁজ করে রাখা।

আম্মু প্লেটে ভাত নিতে নিতে চোখের কোণা দিয়ে আমাকে দেখে মুখ কুঁচকালেন, বললেন, "ছিঃ, তোর গায়ে দেখি বোটকা গন্ধ।"

আমি লজ্জায় কুঁকড়ে গেলাম। আপু আর ভাইয়া কী সুন্দর কাপড় পরে খেতে বসেছে, আর আমি ময়লা খাটো একটা পায়জামার ওপরে একটা ময়লা শার্ট পরে আছি। শরীরে গন্ধ থাকতেই পারে। আম্মু বললেন, "তোর পড়াশোনার কী খবর?"

আমি কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার পড়াশোনার অবস্থা একেবারেই ভাল না, অঙ্ক ছাড়া আর কিছু পড়তে ইচ্ছে করে না। সেই অঙ্কেও পরীক্ষায় কোন নম্বর পাই না। স্যাররা যে নিয়মে করতে বলেন সেই নিয়মে না করলে নম্বর দেন না আর যদিও তাদের নিয়মে করি স্যাররা মনে করেন আমি নকল্ করেছি। প্রথম যখন আম্মু আমাকে ঘেন্না করতে শুরু করেছিলেন তখন আমার পুরো জগৎটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল, এখন বেশ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। মেনেই নিয়েছি যে এটাই হবে। তবে পড়াশোনা করাটা অন্য একটা ব্যাপার— কারো মন ভেঙ্গে গেলে পড়াশোনা করতে পারে না। আম্মু স্কুলের বেতনই দিতে চান না, অনেক কষ্ট করে ভাইয়া-আপুকে বলে সেটা জোগাড় করতে হয়। স্কুলের বইও আমার নেই, কিছু পুরানো বইয়ের দোকান থেকে কিনেছি, কিছু ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়ের কাছে থেকে চুরি করেছি। বইপত্র খাতা কলম না থাকলে মানুষ কেমন করে পড়ে? কাজেই আমি আম্মুর প্রশ্নের কোন উত্তর দিলাম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

আম্মু ইলিশ মাছের পেটিগুলো ভাইয়া আর আপুর প্লেটে তুলে দিতে দিতে বললেন, "কী হলো? কথার উত্তর দিস না কেন?"

আমি এবারেও কিছু বললাম না, মাথাটা আরো নিচু করে ফেললাম।

আম্মু বললেন, "পড়াশোনা করবি না কিছু না, চুরি-চামারি করে বেড়াবি আর আমি তোর পিছনে টাকা ঢালব সেটা হবে না। বুঝেছিস?"

আমি মাথা নাড়লাম। আম্মু বললেন, "শুনে রাখ, তুই যদি পাস করতে না পারিস তোর পড়াশোনা বন্ধ।"

আমি আবার মাথা নাড়লাম, সত্যি কথা বলতে কী মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। পড়াশোনা যে আমার জন্যে নয় সেটা বেশ কিছুদিন হলো আমি বুঝে গেছি, শুধু সেটার জন্যে কষ্ট করার কোন মানে হয় না। যখন আব্বু বেঁচেছিলেন, যখন সবাই আমাকে আদর করতো তখন আমার কতো রকম স্বপ্ন ছিল। এখন আমার কোন স্বপ্ন নেই, সবচেয়ে বড় কথা সেটা নিয়ে কোন দুঃখও নেই।

আম্মু বললেন, "যা সামনে থেকে।"

আমি সুড়ুৎ করে আমার স্টোররুমে চলে এলাম।

রাত ঠিক দশটার সময় আমার অতিথি চলে এলো, আমি আজকাল নেংটি ইঁদুরটার জন্যে অপেক্ষা করে থাকি। ছোট ছোট লাফ দিয়ে বেশ নির্ভয়ে সে আমার হাতে উঠে কুটুর কুটুর করে তার রুটিটা খেতে শুরু করলো। আমি ফিসফিস করে বললাম, "কী খবর মিচকি মিয়া?"

নেংটি ইঁদুর আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "মিচকি মিয়া। আজকে আমার জন্যে গুড নিউজ। আমার আর পড়াশোনা করতে হবে না! কী মজা, তাই না?"

মিচকি মাথা নাড়লো, পড়াশোনা না করা যে অনেক আনন্দ সেটা সেও স্বীকার করে নিল। আমি বললাম, "তার মানে বুঝেছিস? আমার বাসা থেকে পালানোর সময়টা এসে গেছে। একা একা থাকতে তোর মন খারাপ হবে নাকী?"

মিচকি আবার মাথা নাড়লো, আমি ধরে নিলাম তার মানে হচ্ছে "হ্যাঁ।" আমি বললাম, "মন খারাপ করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মিচকি রুটির প্রথম টুকরোটা শেষ করে দ্বিতীয় টুকরোর জন্যে এদিক সেদিক তাকাতে থাকে। আমি পকেট থেকে ছোট আরেকটা টুকরো বের করে তাকে ধরিয়ে দিলাম, সে সাথে সাথে গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটা খেতে শুরু করলো। এইটুকু একটা প্রাণী কিন্তু তার পেটের সাইজটা মনে হয় খারাপ না!

আমি বললাম, "তুই ইচ্ছে করলে আমার সাথে যেতে পারিস। আমার পকেটে থাকবি। ঘুমাবি। ঘুরে বেড়াবি আমার সাথে। যাবি?"

মিচকি তার খাওয়া নিয়ে এতো ব্যস্ত ছিল যে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বেশি আগ্রহ দেখালো না।

আমি পরের দিন সকাল এগারোটার সময় বাসা থেকে পালিয়ে গেলাম। সেদিনই যে বাসা থেকে পালাব সেটা আমি আগে থেকে ঠিক করি নাই। দিনটি ছুটির দিন, স্কুল কলেজ অফিস সবকিছু বন্ধ কাজেই সবাই বাসায়। ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়েছে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি শুনতে পাচ্ছি অন্য সবাই উঠে গেছে, ব্যস্ত গলায় কথা বলতে বলতে ঘরের ভেতরে হাঁটাহাঁটি করছে। ভাইয়া আপু আর আম্মুর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল তারা কোথাও যাবে তাই তাড়াহুড়ো করে রেডি হচ্ছে। সবাই যদি সারাদিনের জন্যে চলে যায় তাহলে খারাপ হয় না, পুরো বাসাটা তাহলে আমি পেয়ে যাব, এই ছোট স্টোররুমের বাইরেও আমি একটু নাড়াচাড়া করতে পারব।

আমি শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছিলাম কখন সবাই বের হয়ে যায়, তখন হঠাৎ ভাইয়ার গলার স্বর শুনতে পেলাম, "তপু, এই তপু।"

আমি একটু চমকে উঠলাম, এই বাসাতেও থাকলেও সবাই এমন ভাব করতো যে আমি আসলে এখানে নেই। আজকে ভাইয়া আমাকে ডাকছে, স্বীকার করে নিচ্ছে যে আমি আসলে এই বাসায় আছি। ব্যাপারটা কী? আমি লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে স্টোররুম থেকে বের হয়ে এলাম। ভাইয়া তার ঘর থেকে আমাকে ডাকছে, আমি সাবধানে ঘরে ঢুকলাম। ভাইয়া বলল, "তপু, দ্যাখ জুতো দুটি কী ময়লা হয়েছে। একটু পরিষ্কার করে দে দেখি।"

ভাইয়া খুব স্বাভাবিক গলায় কথাটা বলল, যেন আমি সবসময় তার জুতো পরিষ্কার করে দিই। এই বাসায় আমার একটা নতুন জীবন শুরু হতে যাচ্ছে– কাল রাতে আম্মু বলেছেন পরীক্ষায় পাস করতে না পারলে আমার পড়াশোনা বন্ধ, আজ সকালে ভাইয়া বলছে তার জুতো পরিষ্কার করে দিতে! আমি জুতো জোড়া তুলে নিলাম, একটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে মুছে জুতোগুলো পরিষ্কার করে ব্রাশ দিয়ে খুব সুন্দর করে কালি করে দিলাম। আগে কখনো জুতো কালি করি নাই কিন্তু ভবিষ্যতে করতে হবে না সেটা কে বলেছে? একটু প্র্যাকটিস থাকা মন্দ নয়!

ভাইয়া জুতোগুলো পরে বলল, "বাহ্! একেবারে আয়নার মতো চকচকে বানিয়ে ফেলেছিস। ভেরি গুড।"

আমি কিছু বললাম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। আম্মু ভাইয়া আর আপু সেজেগুঁজে বের হয়ে গেলো দশটার সময়, আমি বের হলাম এগারোটার সময়।

আমি দুলি খালাকে কিছু বলিনি কিন্তু দুলি খালা বুঝে গেলো। বুঝে গিয়েও দুলি খালা আমাকে থামানোর চেষ্টা করল না। আমি যখন আমার ব্যাগের ভিতরে আমার ময়লা কাপড়গুলো আর বীজ গণিতের বইটা ঢুকালাম তখন দরজার চৌকাঠ ধরে দুলি খালা দাঁড়িয়ে রইল। আমি যখন বের হয়ে যাচ্ছিলাম তখন দুলি খালা তার শাড়ির খুট থকে কয়েকটা দুমড়ানো-মোচড়ানো নোট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল, বলল, "নেও। তোমার কাছে রাখো।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না, দুলি খালা লাগবে না।"

"না লাগলেও রাখো।"

আমি কোন কথা না বলে টাকাগুলো পকেটে রাখলাম। দুলি খালা বলল, "সাবধানে থাকবা। তোমার কিন্তু খুব বড় বিপদ।"

আমি কোন কথা বললাম না। দুলি খালা বলল, "মানুষরে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে বাবা-মায়ের দোয়া। তোমার বাবা নাই। তোমার মা তোমার জন্যে দোয়া করে না। তোমার খুব বিপদ।"

আমি বললাম, "তুমি দোয়া করো।"

"আমি দোয়া করি। আমি সব সময় দোয়া করি। কিন্তু আমার দোয়া কুনো কাজে আসে না বাবা।"

আমি আর কোন কথা না বলে বাসা থেকে বের হয়ে এলাম। ব্যাগটা হাতে নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একবার পিছন ফিরে বাসাটাকে দেখে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম।

ছুটির দিন বলে রাস্তাঘাটে ভিড় একটু কম। আমি বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা নিরিবিলি জায়গায় দেওয়ালের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলাম। বাসা থেকে কোন কিছু চিন্তা না করে বের হয়ে এসেছি, এখন কী করব, কোথায় যাব বিষয়টা নিয়ে একটু ভাবতে হবে।

আমি যখন কমলাপুর রেল স্টেশনে পৌঁছেছি তখন বিকাল হয়ে গেছে। ট্রেন স্টেশন মনে হয় কখনোই ফাঁকা হয় না, সব সময়েই হয় কোন ট্রেন যাচ্ছে না

হয় কোন ট্রেন আসছে, মানুষজনের ভিড়। যারা যাচ্ছে এবং যারা আসছে তাদের চেহারায় এক ধরনের ব্যস্ততা থাকে। এদের ছাড়াও স্টেশনে অন্য এক ধরনের মানুষ থাকে, তারা কোথাও যায় না, তারা রেল স্টেশনেই থাকে, এটাই তাদের বাড়িঘর। তাদের চেহারায় কোন ব্যস্ততা নেই। আমার চেহারা নিশ্চয়ই এখন এদের মতো হয়ে গেছে, আমারও কোন ব্যস্ততা নেই। আমি হেঁটে হেঁটে ট্রেনগুলো দেখলাম। কোনটা কোথায় যাচ্ছে ট্রেনের গায়ে লেখা আছে কিন্তু সেটা নিয়ে আমার কোন কৌতূহল নেই। এর মাঝে কোন একটাতে উঠে পড়ব। ইচ্ছে করলে ছাদেও বসতে পারি, সেটা মনে হয় বেশি মজার হবে।

খুঁজে খুঁজে একটা ভাঙ্গাচোরা ট্রেন ঠিক করে আমি তার ছাদে উঠে পড়লাম। এটা নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে যাবে, থামতে থামতে যাবে! সেটাই ভাল, আমার কোন তাড়াহুড়ো নেই। ট্রেনের ছাদে আমার মতো আরো অনেকে আছে। পা দুলিয়ে উদাস মুখে বসে আছে। ট্রেনের ছাদে উঠে বসলে হঠাৎ ভিন্ন একটা অনুভূতি মনে হয়। যারা প্লাটফরমে হাঁটাহাঁটি করতে থাকে তাদেরকে অন্য একটা জগতের মানুষ বলে মনে হয়, মনে হয় আকাশের কাছাকাছি বসে আমি পৃথিবীর মানুষকে দেখছি।

ট্রেনের ইঞ্জিন যখন হুইসিল দিয়ে নড়তে শুরু করল তখন হঠাৎ মনে হলো মেয়ের গলায় কেউ যেন আমাকে ডাকছে! আমি অবাক হয়ে মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম এবং তখন আমার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্যটা দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম প্রিয়াংকা ট্রেনটার পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করছে, "তপু– তপু– তপু–"

আমি কয়েক মুহূর্ত বুঝতে পারলাম না কী করব! এই স্টেশনে প্রিয়াংকা কোথা থেকে এলো, যদি এসেই থাকে তাহলে আমাকে ডাকছে কেন? আর সত্যিই যদি আমাকেই ডাকছে তাহলে কেমন করে জানল আমি এখানে?

ট্রেনটা তখন নড়তে শুরু করেছে, কী করব বুঝতে না পেরে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, তখন প্রিয়াংকা আমাকে দেখে ফেলেছে, সে চিলের মতো চিৎকার করতে লাগলো, "তপু, এই তপু— নাম– নাম তাড়াতাড়ি—"

চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে কীভাবে নামতে হয় আমার জানা নেই। দেখতে দেখতে ট্রেনটার গতি বেড়ে যাচ্ছে, এই মুহূর্তে আমি যদি না নামি তাহলে আর নামতেও পারব না! আমি তাই আগেপিছে কিছু চিন্তা না করে একটা লাফ দিলাম, ট্রেনের ছাদ অনেকটা উঁচু, সেখান থেকে শক্ত প্লাটফর্মে লাফিয়ে পড়া সোজা ব্যাপার না। প্রথমে মনে হলো আমি বুঝি থ্যাঁতলে গেছি, হাড়গোড় সব ভেঙ্গে গেছে, আর কোন দিন বুঝি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব না। প্রিয়াংকা ছুটে

এসে আমাকে ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করছে, চিৎকার করে বলছে, "সর্বনাশ অপু! সর্বনাশ! ব্যথা পেয়েছিস? ব্যথা পেয়েছিস তুই?"

আমি মাথা নাড়লাম। কোঁকাতে কোঁকাতে বললাম, "ঠ্যাং-এর হাড্ডি মনে হয় ভেঙ্গে গেছে।"

প্রিয়াংকা চেঁচাতে লাগলো, "সর্বনাশ! হায় আল্লা! এখন কী হবে?"

আমি প্রিয়াংকাকে ধরে দুই পা হেঁটে বললাম, "নাহ! মনে হয় ভাঙ্গে নাই শুধু মচকেছে।"

প্রিয়াংকার মনে হয় জানে পানি ফিরে এলো। আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী হলো? কাঁদছিস কেন?"

আমি এর আগে কখনো কাউকে তুই করে বলি নি, এই প্রথম সেটা করলাম এবং সেটা করেছি নিজের অজান্তেই।

প্রিয়াংকা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি জানি! আমি সব জানি তপু।"

আমি ভুরু কুচকে প্রিয়াংকার দিকে তাকালাম, জিজ্ঞেস করলাম, "তুই সব কী জানিস?"

"তোর কথা!" প্রিয়াংকা আমার হাত ধরে রেখে কান্না সামলাতে সামলাতে বলল, "আজকে আমি তোদের বাসায় গিয়েছিলাম।"

হঠাৎ করে মনে হলো আমার হৃৎপিণ্ড বুঝি থেমে গেছে। প্রিয়াংকা সব কিছু জেনে গেছে? আমার নিঃশ্বাস মনে হয় বন্ধ হয়ে গেলো, কোনমতে বললাম, "আমার বাসায় গিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ।"

আমি কঠিন গলায় বললাম, "কেন?"

"প্লিজ তপু তুই রাগ করিস না। প্লিজ।"

"কেন গিয়েছিলি আমার বাসায়?"

"তুই অঙ্ক করতে এতো ভালবাসিস। তাই তোর জন্যে একটা গণিতের বই নিয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম তোকে খুশি করে দেব।"

আমি প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুই আমার বাসা কেমন করে চিনেছিস?"

"লুকিয়ে তোর পিছু পিছু গিয়ে একদিন তোর বাসা চিনে এসেছি।"

আমি বিস্ফারিত চোখে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইলাম, এই মেয়েটার কী মাথা খারাপ? প্রিয়াংকা আবার কাঁদতে লাগলো।

আমি বললাম, "কাঁদছিস কেন?"

প্রিয়াংকা আমার হাত ধরে বলল, "তোর এতো কষ্ট তপু। কেউ জানে না! আমি যদি আজকে তোর বাসায় না যেতাম, যদি দুলি খালার সাথে দেখা না হতো তাহলে আমিও জানতাম না।"

আমি কোন কথা না বলে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রিয়াংকা বলল, "দুলি খালা বলল তুই আর সহ্য করতে না পেরে বাসা থেকে চলে গেছিস! এটা হতে পারে না।"

"কী হতে পারে না?"

"আমরা সবাই আছি, আর কেউ তোকে সাহায্য করতে পারবে না? তুই একা একা সহ্য করতে না পেরে বাসা ছেড়ে চলে যাবি? জীবনটা শেষ করে দিবি?"

আমি আস্তে আস্তে বললাম, "আমার আসলে কোন জীবন নাই। আমি আসলে ভাল ছেলে না। আমি চোর। আমি পড়াশোনা করি না– আমি–"

প্রিয়াংকা ফিসফিস করে বলল, "তুই যে এখনো বেঁচে আছিস, তুই যে পাগল হয়ে যাস নাই সেটাই সাংঘাতিক ব্যাপার? প্লিজ তপু তুই এটা করিস না?"

"কী করব না?"

"তুই চলে যাস না।"

"আমি চলে যাব না?"

"না।"

আমি কিছুক্ষণ প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কয়েকবার চেষ্টা করে বললাম, "কেন?"

"তুই বড় হয়ে বিখ্যাত একজন ম্যাথমেটিশিয়ান হবি– এখন যদি তুই তোর জীবনটা শেষ করে ফেলিস, কেমন করে হবে?"

আমি অবাক হয়ে প্রিয়াংকার দিকে তাকালাম, "আমি বড় হয়ে বিখ্যাত ম্যাথমেটিশিয়ান হব?

"হবি না? নিশ্চয়ই হবি। সবাই বলেছে তুই অসম্ভব ভাল ছাত্র ছিলি হঠাৎ করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিস। আসলে তুই পড়াশোনা ছেড়ে দিস নি– তুই আর পড়াশোনা করতে পারছিস না।"

আমি কিছু বললাম না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রিয়াংকা আবার বলল, "সবাই আমাকে বলেছে তুই রাস্তাঘাটে মারামারি করে আসিস বলে তোর হাতে পায়ে শরীরে কেটেফুটে থাকে। আসলে, আসলে–"

প্রিয়াংকা কথাটা শেষ না করে আবার ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললো। আমি চোখ বড় বড় করে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার জন্যে কাঁদতে পারে পৃথিবীতে এরকম মানুষ আছে? প্রিয়াংকা কোনমতে চোখ মুছে বলল, "তোর আব্বু মারা গেছে। তোর আম্মু এখন তোকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়, তোর ভাই-বোন থেকেও নেই, ক্লাসে তোর বন্ধুবান্ধব নেই, তুই একা- কত কষ্টের একটা জীবন! তুই আমাকে একটা সুযোগ দে, আমি তোর আম্মু হব, তোর ভাই হব, বোন হব, তোর বন্ধুবান্ধব হব- দেখিস তুই, খোদার কসম!"

প্রিয়াংকার কথা শুনে আমি হঠাৎ হেসে ফেললাম। আমাকে হাসতে দেখে প্রিয়াংকা একটু উৎসাহ পেলো, বলল, "তুই আমার কথা বিশ্বাস করলি না? আমি ছোট হতে পারি কিন্তু আমি অনেক কিছু করতে পারি। তুই আমাকে সুযোগ দে। প্লিজ।"

"কীসের সুযোগ দেব?"

"বড় হয়ে একজন বিখ্যাত ম্যাথমেটিশিয়ান হবার।"

"ধুর! তোর নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

প্রিয়াংকা মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহুঁ তপু। তুই আমার কথা অবিশ্বাস করিস না। তা না হলে তুই বল, আমি কেমন করে ঢাকা শহরের এক কোটি লোকের মাঝে তোকে খুঁজে বের করলাম? খোদা যদি আমাকে সাহায্য না করতো তাহলে আমি কী তোকে খুঁজে বের করতে পারতাম?"

আমাকে স্বীকার করতেই হলো ঢাকা শহরের এক কোটি লোকের মাঝে একজনকে খুঁজে বের করে ফেলা খুব সহজ কথা নয়। খোদা নিশ্চয়ই সাহায্য করেছে। প্রিয়াংকা চোখ বড় বড় করে বলল, "তার মানে কী বুঝেছিস? তার মানে এটা খোদার ইচ্ছা!"

"কোনটা খোদার ইচ্ছা?"

"যে তুই একজন বিখ্যাত ম্যাথমেটিশিয়ান হবি।"

আমি আবার হাসলাম। এবারে শব্দ করে আর জোরে। অনেক দিন পর আমি সত্যি সত্যি হাসলাম- হাসলে যে এতো ভাল লাগে সেটা আমি কোন দিন জানতাম না। প্রিয়াংকা তার ব্যাগের ভেতর থেকে লাল কাগজ দিয়ে মোড়ানো একটা বই আমার দিকে এগিয়ে দিল, বলল, "এই নে। এই বইটা দেবার জন্যে তোর বাসায় গিয়েছিলাম।"

আমি প্যাকেটটা খুলে দেখি একটা ইংরেজি গণিতের বই। বইটা খুলতেই ভেতরে নানা ধরনের সমীকরণ বের হয়ে এলো আর সেটা দেখে হঠাৎ আমার

জিবে প্রায় পানি এসে গেলো! আমি নিজেও জানতাম গণিত আমার এতো প্রিয় একটা বিষয়। আমি বইটা ব্যাগে ঢুকিয়ে বললাম, "চল যাই।"

"আগে কথা দে, তুই বাসা থেকে পালিয়ে যাবি না।"

"কথা দিলাম।"

"আমাকে ছুঁয়ে কথা দেয়।"

"ছুঁয়ে কথা দিলে কী হয়?"

প্রিয়াংকা গম্ভীর গলায় বলল, "কথা ভেঙ্গে ফেললে যাকে ছুঁয়ে কথা দিয়েছিস সে মরে যায়।"

আমি বললাম, "আমি এসব বিশ্বাস করি না।"

"আমিও করি না। তবু ছুঁয়ে কথা দে। প্লিজ।"

আমি প্রিয়াংকাকে ছুঁয়ে বললাম, "ঠিক আছে কথা দিলাম।"

"গুড।" প্রিয়াংকা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তার চোখ এখনো ভেজা– একজন মানুষের চোখে পানি কিন্তু মুখে হাসি– এটা ভারি বিচিত্র একটা ব্যাপার।

আমরা দুজন তখন হাঁটতে শুরু করলাম। বিকেল পড়ে এসেছে, বাসায় যেতে যেতে অন্ধকার হয়ে যাবে। প্রিয়াংকা বলল, "আগে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিতে হবে।"

"ঠিক আছে পৌঁছে দেব।"

প্রিয়াংকাকে বাসায় পৌঁছে আমি যখন বাসায় রওনা দিয়েছি তখন হঠাৎ আমার মনে হলো আমি আর আগের তপু নই। আমি এখন অন্য রকম একজন তপু। প্রিয়াংকা আমার ভেতরে খুব বড় একটা পরিবর্তন করে ফেলেছে।

নতুন আমি

দুলি খালা আমাকে দেখে অসম্ভব খুশি হয়ে উঠল, বলল, “পাগলী মেয়েটা তোমারে খুঁইজা পাইছে?”

আমি মাথা নাড়লাম। দুলি খালা বলল, “এই রকম মাইয়া আমি জীবনে দেখি নাই। কইলজাটা এক দিকে মাখনের মতো নরম অন্যদিকে পাথরের মতোন শক্ত।”

আমি বললাম, “সেইটা কেমন করে হয়?”

দুলি খালা জ্ঞানী মানুষের মতো বলল, “হয়। প্রথম যখন আসছে আমি তারে কিছু বলি নাই। সে বলছে তোমার পড়ার টেবিলে একটা বই রেখে যাবে। আমি বলছি তোমার নিজের পড়ার টেবিল নাই। তখন বলছে তোমার বিছানার উপর রাখবে। আমি বলছি নিজের বিছানা নাই। তখন বলছে তুমি যেখানে ঘুমাও সেইখানে রাখবে। আমি আর কী করি? এই স্টোররুমে নিয়া আসছি।”

আমি বললাম, “ও!”

দুলি খালা বলল, “এক নজর দেইখাই বুইঝা গেছে। তখন ভেউ ভেউ করে কান্দা শুরু করছে। এই জন্যে বলি কইলজাটা মাখনের মতো নরম।”

আমি বললাম, “ও।”

দুলি খালা বলল, “যখন শুনলো তুমি চইলা গেছ তখন পাগলের মতো হয়া গেল। বলল, আমি খুঁইজা বার করব। আমি বললাম ঢাকা শহরে লাখ লাখ মানুষ! তুমি খুঁজবা কেমনে? সে বলল জানি না। কিন্তু আমি চেষ্টা করমু। খোদা যদি সাহায্য করে তাহলে বার করমু।” দুলি খালা হেসে বলল, “খোদা তারে সাহায্য করছে।”

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, “হ্যাঁ।” তারপর পকেট থেকে দুমড়ানো মোচড়ানো নোটগুলো বের করে দুলি খালার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, “নাও দুলি খালা, তোমার টাকা।”

দুলি খালা বলল, “রাখো তোমার কাছে।”

আমি বললাম, “না দুলি খালা। আমার কাছে রাখলে অনেক বিপদ হতে পারে। আম্মু যদি খুঁজে পায় তাহলে আমাকে খুন করে ফেলবে।”

দুলি খালা মাথা নাড়ল, বলল, “সেইটা সত্যি কথা।” আমার কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে তার শাড়ির খুটে বেঁধে রেখে বলল, “ঠিক আছে। আমি আমার কাছে রাখলাম, তোমার যখন লাগবে তখন আমার কাছ থেকে নিয়ো।”

আমি মাথা নেড়ে স্টোররুমে ঢুকে গেলাম। প্রিয়াংকা আমাকে যে বইটা দিয়েছে সেটা পড়ার জন্যে আমি আর এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করতে পারছিলাম না।

মানুষ যেভাবে ডিটেকটিভ বই পড়ে আমি সেভাবে গণিতের বইটা পড়ে শেষ করলাম। আমি আর দুলি খালা রান্নাঘরে বসে বসে খাই, আজকে খাবার সময়েও বইটা পড়েছি। শুধু দশটার সময় আমার বই পড়া বন্ধ করতে হলো, তখন মিচকি বেড়াতে এলো। আজকাল তার সাহস বেড়েছে, আমার শরীরের উপর দিয়ে ছুটোছুটি করে। ভাল খেয়ে-দেয়ে তার স্বাস্থ্যটাও একটু ভাল হয়েছে মনে হলো। পেটটা নাদুসনুদুস। আমি তার সাথে একটু গল্প গুজব করলাম, ভাব দেখে মনে হয় সে আমার সব কথা বুঝে!

রাত্রে ঘুমাতে ঘুমাতে অনেক দেরি হলো, শোওয়ার পরও চট করে চোখে ঘুম এলো না, মাথার মাঝে জিটা ফাংশন আর অয়লার ইকুয়েশন ঘোরাঘুরি করতে লাগলো! শেষ পর্যন্ত যখন ঘুমিয়েছি তখন নিশ্চয়ই অনেক রাত।

সকালে ঘুম ভাঙল ভাইয়ার ডাকাডাকিতে। আমি চোখ কচলে ভাইয়ার ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “কী হয়েছে ভাইয়া?”

“তুই কাপড় ইস্ত্রি করতে পারিস?”

আমি ইতস্তত করে বললাম, “আগে কখনও করি নি।”

“আগে না করলে কী হয়েছে? এখন করবি। আমার এই প্যান্টটা একটু ইস্ত্রি করে দে দেখি। সাবধান পুড়িয়ে ফেলিস না যেন।”

আমি তাই ভাইয়ার প্যান্টটা ইস্ত্রি করে দিলাম, খুব সাবধানে করেছি যেন না পোড়ে। ভাইয়া দেখে খুব খুশি হয়ে গেল, বলল, “বাহ্! তুই দেখি ভাল ইস্ত্রি করতে পারিস!”

আমি কিছু বললাম না। ভাইয়া তার চেয়ারের উপর রাখা কয়েকটা শার্ট প্যান্ট দেখিয়ে বলল, “এগুলোও ইস্ত্রি করে রাখিস। ঠিক আছে?”

আমি কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

স্কুলে গিয়ে আমার প্রিয়াংকার সাথে দেখা হলো, প্রিয়াংকা এমন ভাব করল যেন কিছুই হয় নি। এমন কী বসলও অন্য জায়গায়, আমার কাছে নয়। আমি একেবারে লিখে দিতে পারি অন্য যে কোন ছেলে-মেয়ে যদি আমার ব্যাপারটা জানতো তাহলে এতক্ষণে পুরো স্কুলে সেটা জানাজানি হয়ে যেতো। অনেক দিন পর আজকে আমি ক্লাসে কী পড়াচ্ছে সেটা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনারও চেষ্টা করলাম। দীর্ঘদিন পড়াশোনা না করে করে আমার অভ্যাসও চলে গেছে, স্যারদের কথাবার্তায় মনোযোগও ধরে রাখতে পারি না। ফোর্থ পিরিয়ডে ক্লাসে একটা নোটিশ এলো, স্যার নোটিশটা পড়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, "জয়ন্ত, মামুন আর মৌটুসি তোরা তিনজন ক্লাস ছুটির পর শিরীন ম্যাডামের সাথে দেখা করবি।"

জয়ন্ত মামুন আর মৌটুসি হচ্ছে ক্লাসের প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ছাত্রছাত্রী। কাজেই তাদের কোন ঝামেলার মাঝে পড়ে শাস্তির জন্যে যেতে হচ্ছে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মৌটুসি হাত তুলে জিজ্ঞেস করল, "কেন স্যার?"

স্যার ভুরু কুঁচকে নোটিশটা আরেকবার পড়ে বললেন, "কী জানি! গণিত অলিম্পিয়াড না কী যেন হচ্ছে।"

"সেটা কী স্যার?"

স্যার আবার নোটিশটা পড়লেন, পড়ে বললেন, "মনে হয় গণিতের একটা কম্পিটিশান হবে সেখানে তোরা যাবি।"

মৌটুসি চোখ বড় বড় করে বলল, "গণিতের কম্পিটিশান?" তারপর হি হি করে হেসে ফেলল। চিন্তা করলে ব্যাপারটা আসলেই হাস্যকর– কয়েকজন কাগজে কলমে হাঁসফাঁস করে অঙ্ক করছে, কার আগে কে করতে পারে সেটা নিয়ে প্রতিযোগিতা!

প্রিয়াংকা হাত তুলে বলল, "স্যার, এই গণিতের কম্পিটিশনে সবচেয়ে ভাল যে গণিত পারে তাদেরকে পাঠানো উচিত না?"

স্যার বললেন, "তাই তো উচিত।"

"তাহলে স্যার আলাদা করে ক্লাসে একটা গণিতের কম্পিটিশন করা উচিত না? কে ভাল গণিত পারে সেটা বের করা উচিত না?"

স্যার চোখ পিটপিট করে প্রিয়াংকার দিকে তাকালেন, "কেন? তোর কী খুব যাবার শখ নাকী?"

"না স্যার।" প্রিয়াংকা মাথা নাড়ল, বলল, "আমার শখ নেই স্যার। আমি গণিতে খুব দুর্বল! কিন্তু অন্য কেউ তো থাকতে পারে যারা গণিতে খুব ভাল!"

"তা নিশ্চয়ই পারে।" বলে স্যার হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন। প্রিয়াংকা মন খারাপ করে বসে পড়ল, সে নিশ্চয়ই আমার জন্যে চেষ্টা করছিল! আমার অবশ্যি গণিতের কম্পিটিশনে যাবার এক বিন্দু ইচ্ছে নেই! এইসব কম্পিটিশন আমার জন্যে নয়!

প্রিয়াংকা অবশ্যি চেষ্টা করা ছাড়ল না, শিরীন ম্যাডামের কাছে গিয়ে চেষ্টা করল, শিরীন ম্যাডাম নতুন করে ঝামেলা করতে রাজি হলেন না, স্কুলের ফার্স্ট সেকেন্ড আর থার্ড ছাত্রছাত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলেন। প্রিয়াংকা তখন সাহস করে একেবারে প্রিন্সিপাল ম্যাডামের কাছে হাজির হলো, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম মন দিয়ে তার কথা শুনে বললেন, এবার হাতে একেবারে সময় নেই। পরেরবার চেষ্টা করা যাবে। তা ছাড়া গণিতের কম্পিটিশন একটা বিচিত্র বিষয়– আগে কখনো এরকম কিছু হয় নি। যারা আয়োজন করছে কয়দিনের ভিতরেই তাদের উৎসাহ ফুরিয়ে যাবে– কাজেই বিষয়টা নিয়ে বেশি হৈচৈ করার কোন প্রয়োজন নেই।

গণিত প্রতিযোগিতায় আমাকে ঢোকাতে না পেরে প্রিয়াংকা খুব মন খারাপ করল, তার ধারণা আমি যদি কোনভাবে সেখানে যেতে পারি তাহলেই একটা ফাটাফাটি কিছু করে ফেলতে পারব। আমার অবশ্য এমন কিছু মন খারাপ হলো না– অনেক দিন থেকেই এসব জিনিস থেকে আমি অনেক দূরে চলে গেছি। আগে আমি খুব ভাল ডিবেট করতাম এখন শুদ্ধভাবে কথাই বলতে পারি না।

তবে প্রিয়াংকা আমাকে নিয়ে হাল ছাড়লো না। স্কুল ছুটির পর প্রতিদিন প্রিয়াংকা আমার সাথে হেঁটে যেতে শুরু করলো। হেঁটে হেঁটে সে আমাকে নানারকম উপদেশ দিতো– তার উপদেশ যে খুব কাজের উপদেশ তা নয়, কিন্তু একজন মানুষ আমার জন্যে চিন্তাভাবনা করছে, আমাকে নিয়ে ভাবছে সেটাই আমার জন্যে অনেক কিছু। বিকালবেলা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার সাথে আমার এ ধরনের কথাবার্তা হতো :

"বুঝলি তপু কখনো হাল ছেড়ে দিবি না। সব সময় বুকের মাঝে আশা ধরে রাখবি।"

আমি বলতাম "রাখব।"

"বড় কিছু করতে হলে বড় কিছু স্বপ্ন দেখতে হয়।"

"ও।"

"তোকেও বড় স্বপ্ন দেখতে হবে। বুঝেছিস?"

"বুঝেছি।"

"শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে। তোকে নিয়মিত খেলাধুলাও করতে হবে।"

"ও।"

"শুধু অংকে ভাল করলে হবে না। সব সাবজেক্টে ভাল করতে হবে।"

"ও।"

"সব সাবজেক্ট মন দিয়ে পড়তে হবে।"

"আচ্ছা।"

"দেরি করে ঘুমাবি না। ভাল শরীরের জন্যে ঘুম খুব দরকার।"

"ও।"

"আর তোর একা একা থাকার অভ্যাস ছাড়তে হবে।"

"তাই নাকি?"

"অবশ্যই। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা এতো সুইট অথচ তোর কোন বন্ধু নেই।"

আমি বললাম, "কে বলেছে বন্ধু নাই! তুই আছিস।"

"আর কে আছে?"

"আমার আরেকজন বন্ধুর নাম মিচকি।"

"মিচকি?" প্রিয়াংকা ভুরু কুঁচকে বলল, "ফাজলামি করবি না।"

"খোদার কসম।" আমি হাসতে হাসতে বললাম, "তোর সাথে একদিন পরিচয় করিয়ে দেবো। ভয় পাবি না তো?"

"ভয় পাব কেন?"

"অনেকে ইঁদুরকে ভয় পায় তো!"

"ইঁদুর?" প্রিয়াংকা মুখ বিকৃত করে বলল, "ছিঃ! মাগো ঘেন্না!"

"মিচকি মোটেও সেরকম ইঁদুর না। খুব লক্ষী। প্রত্যেকদিন রাত দশটার সময় আমার কাছে বেড়াতে আসে।"

আমি প্রিয়াংকাকে মিচকি সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা বলি কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয় না, প্রিয়াংকা মুখ বিকৃত করে বলে, "ছিঃ! মাগো ঘেন্না!"

আমি টের পেলাম খুব ধীরে ধীরে আমার একটা পরিবর্তন হলো। আমি নিজেকে খুব খারাপ ভাবতে শুরু করেছিলাম সেটা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে শুরু করল। আমি পড়াশোনা শেষ করে একজন বড় ম্যাথমেটিশিয়ান হতে পারব সেটাও আজকাল খুব অসম্ভব মনে হয় না। প্রিয়াংকা বড় মানুষের মতো অনেক উপদেশ দেয়, বেশিরভাগ উপদেশই হাস্যকর তবে একটা উপদেশ মনে

হয় সত্যি। নিজের ওপরে বিশ্বাস রাখা খুব জরুরি, খুব আস্তে আস্তে মনে হয় আমার নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে আসছে।

যেমন সেদিন সকালে আমি প্রিয়াংকার গণিত বইটাতে একটা সিরিজ খুঁজে পেলাম যেটার যোগফল দুটো ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা হতে পারে। একভাবে যোগ করলে এক রকম অন্যভাবে যোগ করলে অন্য রকম, আমি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি তখন হঠাৎ ভাইয়া আমাকে ডাকতে শুরু করল। আমি উঠে ভাইয়ার ঘরে গেলাম। ভাইয়া কলেজে যাবার জন্যে কাপড় পরছে, আমাকে একটা প্যান্ট ছুড়ে দিয়ে বলল, "তপু এই প্যান্টটা আমাকে ইস্ত্রি করে দে দেখি।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না।"

ভাইয়া অবাক হয়ে বলল, "না? ইস্ত্রি করে দিবি না?"

"না।"

"কেন?"

আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না কিন্তু আজকে কী হলো কে জানে খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে উত্তর দিলাম। একেবারে ঠাণ্ডা গলায় বললাম, "তিনটা কারণে। প্রথম কারণ হচ্ছে আমি ব্যস্ত, পড়াশোনা করছি। দ্বিতীয় কারণ প্যান্ট ইস্ত্রি করা এমন কিছু কঠিন না। তোমার নিজের শার্ট-প্যান্ট তুমি নিজে ইস্ত্রি করবে, অন্যকে করে দিতে বলবে না। তৃতীয় কারণ, আমি তোমার ছোট ভাই। তুমি আমাকে বেতন দিয়ে তোমার শার্ট-প্যান্ট ইস্ত্রি করে দেয়ার জন্যে রাখ নাই।"

ভাইয়া বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, প্রথমে অবাক হলো তারপর আস্তে আস্তে রেগে উঠতে লাগলো। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "তোর বেশি সাহস হয়েছে?"

আমি এবারেও একটা ফাটাফাটি উত্তর দিয়ে দিলাম, প্রিয়াংকার সাথে সাথে থেকে আমিও মনে হয় কথা বলা শিখে যাচ্ছি! বললাম, "উঁহুঁ। আমার বেশি সাহস হয় নাই, যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু হয়েছে।"

ভাইয়া তখন যেটা করবে বলে ভাবছিলাম সেটাই করল, গলা উচিয়ে আম্মুকে ডাকল। বলল, "আম্মু! তপু আমার প্যান্ট ইস্ত্রি করে দিচ্ছে না!"

আম্মু অফিসে যাবার জন্যে রেডি হচ্ছিলেন সেইভাবে ভাইয়ার ঘরে এসে ঢুকলেন। কোন কথা না বলে আমার চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে গালে একটা চড় দিলেন, তারপর আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে মারার জন্যে কিছু একটা খুঁজতে লাগলেন। আমার কপাল ভাল ভাইয়ার বেল্টগুলো কাছাকাছি কিছু নেই– টেবিলে তার রুলারটা পেয়ে গেলেন, শক্ত লোহার রুলার কিন্তু সাইজে ছোট

বলে মারতে খুব অসুবিধে। সেটা দিয়েই মারতে লাগলেন। আমি সাবধানে থাকার চেষ্টা করলাম তারপরেও একটা মুখে লেগে গেলো এবং আমার ঠোঁটটা কেটে গেল, আম্মু হঠাৎ করে থেমে গেলেন দেখে বুঝতে পারলাম নিশ্চয়ই অনেকখানি কেটেছে। আমার দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে বললেন, "বেশি সাহস হয়েছে তোর?"

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আম্মু বললেন, "এই মুহূর্তে রাজীবের প্যান্ট ইস্ত্রি করে দে।"

আমি মাথা নেড়ে ভাইয়ার প্যান্টটা তুলে নিলাম। আম্মুর অফিসের গাড়ি চলে এসেছে বলে আম্মুকে চলে যেতে হলো। আমি খুব যত্ন করে ভাইয়ার প্যান্টটা ইস্ত্রি করলাম, আমার কাটা ঠোঁট থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে, সেগুলো যেন তার প্যান্টে না পড়ে সে ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকলাম। প্যান্টটা ইস্ত্রি করে আমি সেটা দুই হাতে ধরে ভাইয়ার দিকে এগিয়ে দিলাম, ভাইয়া প্যান্টটা হাতে নিয়ে বলল, "গাধা কোথাকার, আমার কথা শুনলে তোর এরকম মার খেতে হতো না!"

আমি রক্তমাখা মুখে ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, বললাম, "কিন্তু তোমার কথা আমি শুনব না! যতবার তোমার প্যান্ট ইস্ত্রি করতে হবে ততবার তোমাকে আম্মুকে দিয়ে আমাকে পিটাতে হবে। বুঝেছ?"

ভাইয়া কেমন যেন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো, আমি একেবারে সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম, আর কী আশ্চর্য শেষ পর্যন্ত ভাইয়া তার চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি দেখলাম তার চোখে আমার জন্যে ঘেন্না আছে সত্যি কিন্তু তার সাথে সাথে সম্পূর্ণ নতুন একটা জিনিস যোগ হয়েছে, সেটা হচ্ছে ভয়। হঠাৎ করে ভাইয়া আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে। কী আশ্চর্য!

মুখে কাটাকাটি থাকলে, মারের চিহ্ন থাকলে আমি সাধারণত এক দুইদিন স্কুলে যাই না কিন্তু আজকে আমি স্কুলে গেলাম। ঠোঁটটা শুধু যে খারাপ ভাবে কেটেছে তা না, বেশ ফুলেও উঠেছে। আমাকে দেখে ছেলে-মেয়েরা ভয় পেয়ে সরে গেলো, আমি আমার জায়গায় গিয়ে বসলাম। দূর থেকে প্রিয়াংকা আমাকে দেখে এগিয়ে এলো, কছে এসে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোর ঠোঁটটাকে দেখাচ্ছে পাখির ঠোঁটের মতো।"

হাসতে গিয়ে আমার ঠোটে ব্যথা করে উঠল বলে আমি ঠিক করে হাসতে পারলাম না, বললাম, "ফাজলেমি করবি না।"

প্রিয়াংকা মাথাটা আরেকটু কাছে এনে বলল, "আজকে কী দিয়ে মেরেছেন?"

"লোহার রুলার।"

"ইস! প্রিয়াংকার মুখে একটা বেদনার ছায়া পড়ল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কেন?"

আমি হাসি হাসি মুখে বললাম, "কারণ ছিল।"

প্রিয়াংকা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোকে দেখে মনে হচ্ছে মার খেয়ে তোর খুব মজা হয়েছে। হাসছিস বোকার মতো।"

আমি সাবধানে আমার ফুলে ওঠা ঠোঁটটা একবার ছুঁয়ে বললাম, "আসলেই আজকে একটু মজা হয়েছে। আমার ভাইয়া আজকে আমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। আমার সারা মুখে রক্ত তখন আমি যখন ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে ভিলেনের মতো হাসলাম তখন তার জান শুকিয়ে গেছে!"

প্রিয়াংকা নিশ্চয়ই আমাকে উপদেশ দেওয়া শুরু করতো কিন্তু ঠিক তখন কাছাকাছি আরও কয়েকজন চলে আসায় আর শুরু করতে পারল না।

ভাইয়ার সাথে সেই ঘটনা ঘটে যাবার পর থেকে ভাইয়া আর কখনও আমাকে তার শার্ট-প্যান্ট ইস্ত্রি করে দেয়ার কথা বলে না। তাই বলে আমার যে কাজ কমেছে তা নয়। আজকাল মাঝে মাঝেই আমাকে বাথরুম ধুয়ে দিতে হয়। একদিন বাসার সবগুলো বই থেকে ধুলা ঝাড়তে হলো– এই কাজটা অবশ্যি খুব খারাপ না, বসে বসে অনেক দিন পর বইগুলো দেখতে পারলাম। যখন সবকিছু ঠিক ছিল তখন আব্বু আর আম্মু আমাকে অনেক বই কিনে দিতেন, বেশিরভাগ বইয়ে আম্মুর হাতে লেখা 'সোনামনি তপুকে আম্মু' দেখে আমার চোখে হঠাৎ করে পানি এসে যায়। আমার আজকাল দুলি খালাকেও সাহায্য করতে হয়। দুলি খালার যে সাহায্য দরকার তা নয়, আম্মুর ধারণা আমাকে নানা ধরনের কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। আম্মু যদি ধারেকাছে না থাকেন তাহলে দুলি খালা আমাকে কিছু করতে দেয় না। তবে কিছু কিছু কাজ আমার খারাপ লাগে না, দুলি খালাকে দেখে দেখে আমি মোটামুটি রান্না শিখে গিয়েছি। রান্নাঘরে অবশ্যি অনেক মজার মজার ঘটনা দেখা যায়, যেমন গরম ডেকচিতে এক ফোঁটা পানি দিলে সেটা সাথে সাথে বাষ্পীভূত না হয়ে রীতিমতো জীবন্ত একটা প্রাণীর মতো ডেকচিতে ছোটাছুটি করতে থাকে। পেঁয়াজ কাটার সময় নাক চেপে ধরে রেখে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিলে চোখে পানি আসে না, একটা ভাতের সাথে দুই ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে ভাল করে কচলে একটু লবণ দিলে লবণটা বেগুনি হয়ে যায়– এই রকম নানা ধরনের মজার মজার জিনিস আমি রান্নাঘরেই আবিষ্কার

করেছি! দুলি খালাকে আমি বলেছি যে রান্নাঘর আসলে বিরাট একটা ল্যাবরেটরি, সেটা শুনে তার সে কী হাসি।

সবকিছু মিলিয়ে আমার সময়টা এখন আগের থেকে একটু ভাল কারণ আমি মোটামুটি নিয়মিতভাবে পড়াশোনা শুরু করেছি। এই প্রথমবার আমার সবগুলো বই আছে, যেগুলো ছিল না প্রিয়াংকা সেগুলো জোগাড় করে দিয়েছে। শুধু যে বইগুলো জোগাড় করেছে তা না প্রত্যেক দিন আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কী কী পড়েছি। আমার সেটা ভালই লাগে তবে আমি সেটা স্বীকার করি না, ভান করি খুব বিরক্ত হচ্ছি!

আমরা গণিত প্রতিযোগিতার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, স্কুল থেকে কয়েকজনের নাম পাঠানোর পর আর কোন সাড়াশব্দ নেই, তাই আমরা ধরে নিয়েছি এটা আসলে হচ্ছে না। কবিতা আবৃত্তি, ডিবেট কিংবা গানের প্রতিযোগতা হতে পারে কিন্তু গণিতের প্রতিযোগিতাটা আবার কেমন করে হবে? আর সত্যিই যদি হয় কার মাথা খারাপ হয়েছে কাগজ-কলম নিয়ে সেখানে হাজির হবার?

কিন্তু হঠাৎ করে খবরের কাগজে গণিত প্রতিযোগিতার খবর ছাপা হতে শুরু করল। বিভিন্ন স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা সেখানে আসবে, সারাদিন ধরে প্রতিযোগিতা, বিকেলে বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হবে! পৃথিবীতে কতো রকম পাগল যে আছে, যারা এর আয়োজন করছে তাদের নিশ্চয়ই খেয়েদেয়ে আর কোন কাজ নেই!

গণিত প্রতিযোগিতার আগের দিন ক্লাসের শুরুতে প্রিয়াংকাকে দেখা গেল খুব উত্তেজিত, কোন একটা কারণে তার চোখ-মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। সে ক্লাসের সামনে দাড়িয়ে চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে লাগলো, "সবাই শুনো। জরুরি ঘোষণা। জরুরি ঘোষণা।"

ক্লাসের অন্য যে কোন ছেলে বা মেয়ে এভাবে জরুরি ঘোষণা দেওয়ার চেষ্টা করলে কেউ তাকে পাত্তা দিতো না। কিন্তু প্রিয়াংকার যে একটু মাথা খারাপ সেটা এতদিনে সবাই জেনে গেছে, তার নানারকম পাগলামীর জন্যে সবাই তাকে নিয়ে একদিক দিয়ে হাসাহাসি করে অন্যদিক দিয়ে পছন্দ করে! সবাই প্রিয়াংকার জরুরি ঘোষণা শোনার জন্যে কাছাকাছি এগিয়ে এলো।

প্রিয়াংকা হাত নেড়ে বলল, "গণিত প্রতিযোগিতার কথা তোদের মনে আছে?"

বেশিরভাগ ছেলে-মেয়েরাই সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় নাই তাই তারা চিৎকার করে বলল, "না, মনে নাই।"

"মনে না থাকলে শোন! আমাদের স্কুলের সব ক্লাস থেকে তিনজনের নাম পাঠানো হয়েছে, মনে আছে?"

অনেকেই এবারে মাথা নাড়ল। প্রিয়াংকা বলল, "কিন্তু আমাদের ক্লাসে তিনজন থেকে বেশি ছেয়ে-মেয়ে অঙ্কে খুব ভাল। সেইজন্যে আমি ভাবছিলাম আমাদের ক্লাস থকে আরো বেশি ছেলে-মেয়ে পাঠানো দরকার!"

ভাল করে প্রিয়াংকার কথা শোনার জন্যে আমি এবারে একটু এগিয়ে গেলাম। প্রিয়াংকা বক্তৃতা দেওয়ার মতো করে হাত-পা নেড়ে বলল, "আমি পত্রিকায় এই গণিত প্রতিযোগিতার কমিটির ঠিকানা দেখে তাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

আমরা অবাক হয়ে বললাম, "সত্যি?"

"সত্যি।" প্রিয়াংকা যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গি করে বলল, "আমি কমিটির প্রেসিডেন্টকে বলেছি আমাদেরকে আরো বেশি ছেলেমেয়েদের নাম দিতে হবে।"

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "তখন তারা কী বলল?"

"প্রথমে তারা বলেছে রেজিস্ট্রেশনের সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তখন ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলাম।"

মৌটুসি জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে ঘ্যান ঘ্যান করলি?"

প্রিয়াংকা তখন অভিনয় করে দেখালো সে কেমন করে ঘ্যান ঘ্যান করেছে, দুই হাত জোড় করে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কান্না কান্না গলায় নেকু নেকু ভঙ্গিতে বলতে লাগলো, "প্লিজ প্লিজ প্লিজ প্লিজ..."

তার অভিনয়টা এতো মজার হলো যে দেখে আমরা সবাই হি হি করে হেসে ফেললাম। প্রিয়াংকা নিজেও হেসে ফেলল, বলল, "আমার ঘ্যান ঘ্যানানিতে বিরক্ত হয়ে কমিটির প্রেসিডেন্ট বলল, "ঠিক আছে, বলো তোমার আর কতোজন দরকার?" আমি বললাম "চল্লিশজন–" সেটা শুনে প্রেসিডেন্টের হার্ট এটাকের মতো অবস্থা! সে বলল, "দুইজন" আমি বললাম, "তিরিশজন" সে বলল, "তিনজন" এইভাবে শেষ পর্যন্ত মুলামুলি করে দশজনে রাজি করিয়েছি!" প্রিয়াংকা তখন বিজয়ীর মতো ভঙ্গি করে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁড়ালো এবং আমরা সবাই হাততালি দিলাম।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "কোন দশজন?"

"আমার তক্ষুণি রেজিস্ট্রেশান করাতে হবে, তাই যার যার নাম মনে এসেছে লিখে দিয়ে এসেছি। পাঁচজন ছেলে আর পাঁচজন মেয়ে।" প্রিয়াংকা তার ব্যাগ থেকে কিছু কাগজ বের করে বলল, "এই যে রেজিস্ট্রেশান কার্ড। কালকে কম্পিটিশনের সময় এই কার্ড সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।"

প্রিয়াংকা একজন একজন করে দশজনের নাম পড়ে তাদেরকে কার্ডটা দিয়ে দিল। সে যখন আমার নামটা পড়লো সবাই বিস্ময়ের একটা শব্দ করল, আমার মতো একজন ছেলে যে এরকম প্রতিযোগিতায় যেতে পারে কেউ সেটা বিশ্বাসই করতে পারে না। সবাই ভাবল এটা এক ধরনের রসিকতা, আমিও সেরকম ভান করে কার্ডটা নিলাম। কেউ জানে না, শুধু আমি জানি, আমাকে প্রতিযোগিতায় নেবার জন্যে প্রিয়াংকা এতো পরিশ্রম করেছে! আমি এই মেয়েটাকে যতই দেখছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই দশজনের ভিতরে প্রিয়াংকার নিজের নাম নাই কেন শিউলি সেটা জানতে চাইল। প্রিয়াংকা তখন দাঁত বের করে হেসে বলল, "অঙ্ক আমি দুই চোখে দেখতে পারি না!" সবাই তখন প্রতিবাদের মতো একটা শব্দ করতেই প্রিয়াংকা হাত তুলে সবাইকে শান্ত করে বলল, "কিন্তু ভাবিস না আমি ফাঁকি দেব। আমি কালকে কম্পিটিশনে থাকব ভলান্টিয়ার হিসাবে।" প্রিয়াংকা দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমার উৎসাহ দেখে কমিটির প্রেসিডেন্ট আমাকে ভলান্টিয়ার বানিয়ে দিয়েছে।"

কম্পিটিশান

পরের দিন গণিত প্রতিযোগিতায় গিয়ে আমার আক্কেল গুড়ুম। বিয়ে বাড়ির মতো একটা গেট বানানো হয়েছে, তার কাছে একটা ব্যান্ডপার্টি। প্যাঁ প্যাঁ করে কয়েকজন ব্যাগ পাইপ বাজাচ্ছে তার সাথে ঢোল। ভিতরে ছোট ছোট স্টল, সেখানে মেলার মতো আয়োজন। কোথাও গণিতের বই কোথাও বিজ্ঞানের বই। এক জায়গায় গণিতের ধাঁধা, সঠিক উত্তর বলতে পারলেই পুরস্কার! আমার ধারণা ছিল অঙ্কের মতো নীরস একটা বিষয়ের প্রতিযোগিতায় আর কতজন আসবে? কিন্তু ভিতরে ঢুকে আমি হতবাক হয়ে গেলাম, ছোট ছোট চশমা পরা ছেলে-মেয়েরা হাতে প্লাস্টিকের রুলার আর জ্যামিতি বক্স নিয়ে গম্ভীরভাবে ঘোরাঘুরি করছে। বিশাল একটা প্যান্ডেল, তার নিচে সারি সারি চেয়ার পাতা, সবাই সেখানে বসে যাচ্ছে। আমি প্রিয়াংকাকে খুঁজলাম, যারা ভলান্টিয়ার তারা নীল রংয়ের টি শার্ট পরে ব্যস্ততার ভান করে ঘোরাঘুরি করছে। আমি তাকে খুঁজে পেলাম না।

সাড়ে নয়টার সময় শুরু হবার কথা, আমি লিখে দিতে পারি সাড়ে দশটার এক মিনিট আগেও শুরু করতে পারবে না। আমার হাতে ঘড়ি নেই, আমি পাশের ছেলেটার হাতে দেখলাম সাড়ে নয়টা বেজে গেছে। শুরু না হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই, তাই আমি মাত্র চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছি তখন অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেলো। বুড়ো এবং রাগী রাগী চেহারার কয়েকজন মানুষ স্টেজে এসে বসেছে, আমি গুনে দেখলাম নয়জন। এই নয়জনের সবাই বক্তৃতা দিবে, কমপক্ষে দশ মিনিট করে। নয় দশে নব্বই মিনিট, তার মানে পাকা দেড় ঘণ্টা! মানুষের বক্তৃতার মতো খারাপ জিনিস আর কিছু নেই, এখন পাকা দেড় ঘণ্টা এই রাগী রাগী চেহারার মানুষগুলোর বক্তৃতা শুনতে হবে ভেবে মনটাই খারাপ হয়ে গেলো।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে হালকা-পাতলা একটা মেয়ে। মেয়েটা খুব হাসিখুশি, সবসময়েই হাসছে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কথা বলছে যে দেখে মনে হয় সুন্দর করে কথা বলার মতো সহজ কাজ আর কিছুই নয়!

প্রিয়াংকা যখন বড় হবে, তখন নিশ্চয়ই এভাবে কথা বলবে। মেয়েটা গণিত প্রতিযোগিতার নিয়মকানুনগুলো বলে দিয়ে রাগী চেহারার একজনকে ডাকলো প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ঘোষণা করতে। রাগী চেহারার মানুষটি কোন একটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, সে এসে দুই এক কথা বলে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে দিল! কী আশ্চর্য ব্যাপার– আর কোন বক্তৃতা নাই। স্টেজে বসে থাকা আরো আটজন রাগী রাগী চেহারার বুড়ো মানুষগুলো নিশ্চয়ই খুব রাগ হয়েছে যে তাদের বক্তৃতা দিতে ডাকছে না কিন্তু ততক্ষণে সব ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করে কম্পিটিশনে অঙ্ক করার জন্যে তাদের ঘরের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। এখন তারা বক্তৃতা দিলেও কেউ শুনবে না। হালকা-পাতলা মেয়েটা যে কাউকে বক্তৃতা দিতে দেয় নাই সে জন্যে আমার ইচ্ছে হলো তাকে এক স্টিক চুইংগাম দিয়ে আসি!

আমরা সবাই ক্লাস রুমে বসে আছি, আমার ডানদিকে অসম্ভব মোটা একটা ছেলে, বাম দিকে চশমা পরা শ্যামলা রংয়ের একটা মেয়ে। আমাদের স্কুলের অন্য ছেলে-মেয়েরা কোথায় বসেছে আমি জানি না, আশেপাশে কাউকে দেখছি না। আমাদের রুমটা বেশ বড়– সব মিলিয়ে প্রায় একশ' জন ছেলে-মেয়ে এসে বসেছে। অঙ্ক কম্পিটিশনটা কীরকম হবে সে বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই, তাই ধৈর্য ধরে বসে আছি।

এরকম সময় ঘণ্টা পড়ল এবং সাথে সাতে ক্লাস রুমের শিক্ষকেরা সবার হাতে একটা করে খাতা আর প্রশ্ন দিতে লাগলো। আমার ডান পাশের মোটা ছেলেটা চোখ বন্ধ করে একটা দোয়া পড়ে নিজের বুকে ফুঁ দিল, তারপর প্রশ্নটা এবং হাতের কলমটাকে একটা চুমু খেয়ে মাথায় লাগালো। বাম পাশের মেয়েটা অবশ্যি দোয়া দরুদের মাঝে গেল না, সরাসরি অঙ্ক কষার মাঝে লেগে গেলো। আমিও আমার প্রশ্নটার দিকে তাকালাম। দুই ঘণ্টা সময়, তার মাঝে দশটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নগুলো বাংলা আর ইংরেজিতে, ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলে-মেয়েরাও যেন আসতে পারে সেজন্যে এই ব্যবস্থা।

আমি প্রশ্নগুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম– প্রশ্নগুলো একবারেই সোজা– একবার সন্দেহ হলো ভুল করে অন্য কোন ক্লাসের প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছে কী না কে জানে! ভাল করে দেখলাম, আমাকে ঠিক প্রশ্নই দিয়েছে। এতো হৈচৈ করে গণিত প্রতিযোগিতা করছে—কিন্তু এরকম সোজা বাচ্চা পোলাপানের প্রশ্ন দিলো ব্যাপারটা কী? আমি ডানে-বামে সামনে-পিছনে তাকালাম, নাহ্, অন্য সবাই তো দেখি পেন্সিল কামড়ে কামড়ে গম্ভীর মুখে অঙ্ক করতে শুরু করেছে, মনে হয় প্রথম দিকে সোজা প্রশ্নগুলো দিয়ে শেষের দিকে কঠিন প্রশ্ন দিয়েছে।

আমি শেষের প্রশ্নগুলো দেখলাম– আসলেই কঠিন! শুধু কঠিন না একেবারে ফাটাফাটি কঠিন। আমি কঠিন প্রশ্নটা পড়ে একটু হকচকিয়ে গেলাম– প্রশ্নটা কঠিন হতে পারে কিন্তু খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন। শুধু প্রশ্নটা পড়েই আমার বুকটা ভরে গেলো, যারা এইরকম চমৎকার একটা প্রশ্ন করতে পারে তাদের মাথায় না জানি কতো বুদ্ধি! আগে সোজা প্রশ্নগুলো শেষ করে কঠিন প্রশ্নটা ধরা উচিত কিন্তু আমার যে কী হলো আমি কঠিন প্রশ্নটার উত্তর বের করতে শুরু করলাম।

আসল প্রশ্নটার উত্তর বের করার আগে আমার অন্য দুই একটি জিনিস প্রমাণ করতে হলো, সেগুলো প্রমাণ করার জন্যে আরো কয়েকটা জিনিস প্রমাণ করতে হলো। সবগুলো প্রমাণ শেষ করে যখন আসল সমস্যাটা করতে শুরু করেছি তখন মাঝামাঝি এসে আটকে গেলাম। শেষ পর্যন্ত কী ভাবে করতে হবে যখন হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম তখন আমার যা আনন্দ হলো সেটা বলার মতো নয়! ঝটপট পুরোটা শেষ করে, আমি অন্য সমস্যাগুলো করতে বসলাম। মাত্র প্রথমটা শুরু করেছি তখন দেখি কে যেন আমার খাতাটা ধরে টানছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি হলের গার্ড, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"সময় শেষ।"

সময় শেষ মানে? আমি চমকে উঠলাম, প্রশ্নের উপর স্পষ্ট লেখা আছে সময় দুই ঘণ্টা। আমি বললাম, "দুই ঘণ্টা সময় না?"

"হ্যাঁ। দুই ঘণ্টা শেষ।"

"দুই ঘণ্টা শেষ?" আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, "দুই ঘণ্টা কী ভাবে শেষ হলো?"

গার্ড মুচকি হেসে বলল, যখন সময় খুব ভাল কাটে তখন কীভাবে যে সময় চলে যায় কেউ জানে না!" তারপর হা হা করে হেসে উঠল, যেন খুব একটা উঁচু দরের রসিকতা করেছে।

আমার খাতাটা টেনে নিয়ে চলে যেতে যেতে মানুষটা ফিরে এলো, বলল, "কী ব্যাপার খাতায় দেখি নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর কিছুই লিখ নি?"

মানুষটা নাম লেখার জন্যে খাতাটা ফিরিয়ে দিল– একবার ভাবলাম লিখব না– লিখে লাভ কী? কিন্তু মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে তাই লিখতে হলো।

পরীক্ষার হল থেকে বের হতেই আমার প্রিয়াংকার সাথে দেখা হলো, সে এক বান্ডিল কাগজ নিয়ে কোথায় জানি ছুটে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলো, চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলো, "কেমন হয়েছে?"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। আমতা আমতা করে বললাম, "না, মানে ইয়ে– হঠাৎ করে দেখি সময় শেষ হয়ে গেল।"

"কয়টা করেছিস?"

"এ-একটা।"

প্রিয়াংকার মুখটা দপ করে নিভে গেলো। শুকনো মুখে বলল, "মাত্র একটা? সবাই যে বলছে খুব সোজা হয়েছে প্রশ্ন?"

"হ্যাঁ মানে ইয়ে–" আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। ইচ্ছে হলো নিজের পিছনে একটা লাথি মারি! যদি শুধু সোজা প্রশ্নগুলো দিয়ে শুরু করতাম তাহলে আমিও অনেকগুলো করে ফেলতে পারতাম।

প্রিয়াংকা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যাই হোক। পরের বার ভাল করে করবি। আমি এখন যাই– এই কাগজগুলো এখনই নিয়ে যেতে হবে।"

প্রিয়াংকা হাতের কাগজের বান্ডিল নিয়ে ছুটে যেতে শুরু করল। ভলান্টিয়ারদের জন্যে আলাদা ভাবে তৈরি করা নীল রংয়ের একটা টি শার্ট পরেছে, বুকের মাঝে নাম লেখা ব্যাজ, খুব মানিয়েছে তাকে! দেখে মনে হচ্ছে তার জন্মই হয়েছে ভলান্টিয়ার হওয়ার জন্যে!

আমি মন খারাপ করে প্যান্ডেলের নিচে এসে দাঁড়ালাম। সবাই একজনের সাথে আরেকজন কথা বলছে, কার কয়টা হয়েছে বোঝার চেষ্টা করেছে। যখনই একটার উত্তর মিলে যাচ্ছে তখনই তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, যখন মিলছে না তখন মুখটা কালো করে ফেলেছে! আমিই শুধু একা একা দাঁড়িয়ে রইলাম। জয়ন্ত মামুন আর মৌটুসিকে দেখলাম কথা বলতে বলতে আসছে, আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলো। মামুন ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করল, "কেমন হয়েছে?"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "হয়েছে একরকম।"

"কয়টা হয়েছে?"

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "একটা।"

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তারা হাসি গোপন করল। জয়ন্ত ভদ্রতা করে বলল, "ও, আচ্ছা।"

আমি জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কয়টা হয়েছে?"

"পাঁচটা কনফার্ম। ছয় নম্বরটা কারো কারো সাথে মিলছে কারো কারো সাথে মিলছে না।"

"ও।"

জয়ন্ত, মামুন আর মৌটুসি তখন জুস খেতে খেতে চলে গেলো। আমার খেয়াল হলো আমার হাতেও একটা জুস, যারা আজকে কম্পিটিশনে অংশ

নিয়েছে সবাইকে এক প্যাকেট করে জুস দিয়েছে। আমি মনমরা হয়ে আমার জুসের প্যাকেটটা খুলে জুস খেতে লাগলাম।

দুপুরে এক ঘণ্টা বিরতি, তারপরে ব্ল্যাকহোলের ওপর একটা বক্তৃতা তারপর পুরস্কার বিতরণী। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমার থাকার কোন ইচ্ছে নেই, কিন্তু ব্ল্যাক হোল নিয়ে কী বলে একটু শোনার ইচ্ছে আছে। তাই বক্তৃতাটা শোনার জন্যে থেকে গেলাম– সকালে রাগী চেহারার একজন বুড়োমতো মানুষ ব্ল্যাক হোল নিয়ে বিশাল একটা বক্তৃতা দিলো। মানুষটার উৎসাহ খুব বেশি এমন ভাবে কথা বলতে লাগলো যেন সে নিজেই টিপে টুপে ব্ল্যাক হোল তৈরি করেছে। বক্তৃতা দিতে দিতে মাঝে মাঝে সে রসিকতা করার চেষ্টা করলো, কিন্তু সেগুলো খুব কাজে এলো না। এক দুইজন ভদ্রতা করে একটু হাসার চেষ্টা করলো কিন্তু বেশির ভাগই মুখ শক্ত করে বসে থাকলো।

ব্ল্যাক হোলের উপর বক্তৃতাটা যত ভাল হবে ভেবেছিলাম সেটা তত ভাল হলো না। আমি মাঝখানেই উঠে যেতাম কিন্তু বসেছি একেবারে মাঝখানে, বের হওয়া খুব কঠিন।

বক্তৃতাটা শেষ হবার সাথে সাথে আমি বের হয়ে দেখি চারপাশে মিলিটারি, বের হওয়ার গেটটাও বন্ধ করে দিয়েছে, কাউকে বের হতে দিচ্ছে না। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম পুরস্কার দেওয়ার জন্যে প্রেসিডেন্ট আসছেন বলে এরকম কড়াকড়ি। যারা ভিতরে আছে তারা এখন আর বের হতে পারবে না।

আমি আর উপায় না দখে পিছনের দিকে একটা চেয়ারে বসলাম। আস্তে আস্তে পুরো প্যান্ডেলটা ভরে গেলো। এদিকে সেদিকে মিলিটারি তাদের অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্টেজটা সুন্দর করে সাজিয়েছে, সেখানে মেডেলগুলো এনে রেখেছে। সকালবেলা যে মেয়েটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিল সেই মেয়েটাকে আবার দেখলাম ব্যস্ত হয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। আমি বসে প্রিয়াংকাকে খুঁজলাম কিন্তু এত ভিড়ে তাকে আমি খুঁজে পেলাম না।

হঠাৎ করে চারিদিকে একটু ব্যস্ততা দেখা গেলো সবাই হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায়। তখন আমি দেখতে পেলাম কয়েকজন মিলিটারি প্রায় ঘেরাও করে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আসছে। একটা দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়া নিশ্চয়ই খুব কষ্টের ব্যাপার—শান্তিমতো কোথাও যেতেও পারে না, সব সময় তাদের আগে-পিছে গোটা দশেক মিলিটারি ঘুরঘুর করতে থাকে!

প্রেসিডেন্ট আসার সাথে সাথে তাকে নিয়ে বেশ কয়েকজন স্টেজে উঠে গেলো। সকালে বক্তৃতা দিতে পারে নি বলে যারা মন খারাপ করেছিল এখন

তাদের খুব উৎফুল্ল দেখা গেলো, মনে হয় এখন তারা সবাই লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেবে। প্রেসিডেন্টদের সময় নিয়ে খুব টানাটানি থাকে তাই ঝটপট অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেলো। হাসি-খুশি মেয়েটা আবার অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে থাকে– সকালে সে অনেক হাসি-তামাশা করেছে এখন প্রেসিডেন্টের সামনে দরকারি কথা ছাড়া আর কোন কথা বলছে না। প্রথমে একজন এসে প্রেসিডেন্টের গুণগান গাইতে লাগলো, একজন প্রেসিডেন্ট এতো ব্যস্ত তারপরেও কষ্ট করে এখানে এসেছেন সেই জন্যে তাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে সে মুখে প্রায় ফেনা তুলে ফেলল। তারপর আরেকজন দাঁড়িয়ে গণিত যে কতো গুরুত্বপূর্ণ সেটার ওপর বিশাল বক্তৃতা দিতে শুরু করল। আরেকজন দাড়িয়ে যারা আয়োজন করেছে তারা যে কতো মহৎ কাজ করেছে সেটার ওপর বিশাল একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললো। বক্তৃতাগুলো একই রকম, একই গলায় একই সুরে বলা হয় একটা শুনলেই মনে হয় সবগুলো শোনা হয়ে গেছে– আমি প্রায় অধৈর্য্য হয়ে গেলাম।

সবার শেষে প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা দিতে উঠলেন, তিনি অল্প কথায় বেশ গুছিয়ে বক্তৃতা দিলেন। গণিত কী রকম জরুরি, আজকের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে ভবিষ্যতের বড় বড় বিজ্ঞানী হবে এরকম খুব ভাল ভাল কথা বললেন। বক্তৃতা শেষ হবার পর সবাই খুব জোরে জোরে হাততালি দিল– প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা শেষ করার পর মনে হয় জোরে জোরে হাততালি দেওয়ার নিয়ম।

হালকা-পাতলা মেয়েটা বলল এখন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করার জন্যে গণিতের একজন প্রফেসরকে অনুরোধ করল। মানুষটার উষ্কখুষ্ক চুল, বড় বড় গোঁফ। মোটামুটি সেজেগুঁজে এসেছে তবু তার চেহারায় ভদ্রলোকের ভাবটা ফুটে ওঠে নি। মানুষটা স্টেজে উঠে প্রথমে গণিত কী রকম কঠিন সেটা নিয়ে একটা রসিকতা করল, কেউ একটুও হাসল না, তাতে একটা লাভ হলো, মানুষটা আর রসিকতা করার চেষ্টা না করে পুরস্কার নেওয়ার জন্যে একজন একজন করে ডাকতে লাগলো।

প্রথমে প্রাইমারি ক্লাস, তারপর জুনিয়র তারপর আমাদের গ্রুপ। সবশেষে কলেজ। দলভিত্তিক পুরস্কার, একক পুরস্কার। আমাদের স্কুল থেকে প্রাইমারি গ্রুপের একটা মেয়ে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়ে গেলো— আমরা সবাই তখন জোরে জোরে হাততালি দিলাম।

সব পুরস্কার দেওয়া শেষ, এখন কেউ একজন সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করে দেবে তারপর প্রেসিডেন্ট চলে গেলে আমারা বাসায় যেতে

পারব। ঠিক কী কারণ জানি না আমার ভেতরটা তেতো হয়ে আছে। আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা ঠিকভাবে হয় নি, কোনটা ঠিকভাবে হয় নি সেটা বুঝতে পারছি না বলেই মেজাজটা আরো বেশি খারাপ হয়ে আছে। উষ্কখুষ্ক চুলের গণিতের প্রফেসর তখন হঠাৎ এমন ভাব করল যেন তার কিছু একটা মনে পড়েছে। হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমরা এতক্ষণ প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চ্যাম্পিয়নদের পুরস্কার দিয়েছি। এখন আমাদের সর্বশেষ পুরস্কার চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন।"

আমি তখন লক্ষ করলাম সত্যিই টেবিলে এখনো একটা পুরস্কার রয়ে গেছে। গণিতের প্রফেসর হাত থেকে একটা কাগজ বের করে বলল, "পুরস্কারটা যাবে সেকন্ডারি গ্রুপে। এই পুরস্কারটা পেয়েছে এমন একটা ছেলে যে এখনই আমার থেকে বেশি গণিত জানে! সব গ্রুপে আমরা একটা করে গণিতের সমস্যা দিয়েছি যেটা এতো কঠিন যে দুই ঘন্টার মাঝে করা সম্ভব নয়। সেকন্ডারি গ্রুপের এই অঙ্কটা আমি করেছি দুই দিনে, তাও অন্য অনেকের সাহায্য নিয়ে। কিন্তু আজকে একজন ছেলে সেই অঙ্কটি করে ফেলেছে। আমাদের কম্পিটিশনে সবগুলো অঙ্কে যত মার্কস ছিল ঐ একটিতে ছিল তার দ্বিগুণ মার্কস! এই ছেলেটি আর কোন অঙ্ক স্পর্শ করে নি, সে শুধু ঐ একটি অঙ্ক করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তাকে আমি মঞ্চে এসে চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে স্বর্ণপদক নেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি।"

ঠিক জানি না কেন হঠাৎ করে আমার চোখে পানি এসে গেলো। আমি শুনলাম উষ্কখুষ্ক চুলের গণিতের প্রফেসর বলছেন, "ছেলেটি বি.কে. হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আরিফুল ইসলাম তপু।"

দর্শকদের ভেতরে কে যেন চিলের মতো শব্দ করে চিৎকার করে উঠল আমি না দেখেই বুঝতে পারলাম সেটা প্রিয়াংকা। সে চিৎকার করেই যাচ্ছে, অন্যদের প্রচণ্ড হাততালিতে সেটা আর শোনা যাচ্ছে না তবু সে থামছে না। গণিতের প্রফেসর তখনো আমাকে খুঁজছেন, মাইকে বলছেন, "কোথায় আরিফুল ইসলাম তপু? রেজিস্ট্রেশন নম্বর সাত এক চার তিন?"

আমি যখন উঠে দাঁড়ালাম আমার পাশে যারা বসেছিল তারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। একজন হাত বাড়িয়ে জোরে জোরে আমার সাথে হ্যান্ডশেক করল, অন্যেরা তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে আমাকে মঞ্চে যাবার জন্যে জায়গা করে দিল। আমি আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে মঞ্চে যাচ্ছি, আমার মনে হচ্ছে সবকিছু যেন একটা অবাস্তব স্বপ্ন! চারপাশে সব কিছু কেমন যেন দুলতে লাগলো, আমি সব কিছু দেখেও দেখছি না। সবাই আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছে,

দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে, দিচ্ছে তো দিচ্ছেই, থামার কোন নাম-নিশানা নেই। আমি তার ভিতরে প্রিয়াংকার চিৎকার শুনতে পাচ্ছি, সে কোথায় আছে কে জানে?

আমাকে কয়েকজন মঞ্চে নিয়ে গেলো। প্রেসিডেন্ট আমাকে মেডেলটা পরিয়ে দিলেন, মনে হলো কয়েকশ' ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলে উঠলো। সত্যি সত্যি কিছুক্ষণের জন্যে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। আমাকে সার্টিফিকেট দেবার সময় প্রেসিডেন্ট সেটা কিছুক্ষণ ধরে রাখলেন যেন ক্যামেরাম্যানরা ভাল করে ছবি তুলতে পারে। তারপর প্রেসিডেন্ট আমার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন, মঞ্চে যারা বসে আছে তারাও দাঁড়িয়ে গেছে আমার সাথে হ্যান্ডশেক করার জন্যে। আমার একজন একজন করে সবার সাথে হ্যান্ডশেক করতে হলো, উষ্কখুষ্ক চুলের গণিতের প্রফেসর হ্যান্ডশেক করেই শান্ত হলেন না, আমার সাথে কোলাকুলি করে ফেললেন।

আমি যখন মঞ্চ থেকে নেমে আসছি তখনও টেলিভিশনের ক্যামেরাগুলো আমার পিছনে পিছনে আসছে। প্যান্ডেলের মাঝামাঝি আসার পর দেখলাম কে যেন দর্শকদের ঠেলে আমার কাছে ছুটে আসছে। মিলিটারিরা তাকে থামানোর চেষ্টা করল, সে কনুই দিয়ে মিলিটারিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আমার কাছে ছুটে এলো। মানুষটি যে প্রিয়াংকা সেটা আমি অনুমান করতে পারছিলাম। কাছে এসে আমাকে ধরে কী যেন বলতে লাগলো, আমি বুঝতে পারলাম না। তার শুধু ঠোঁট নড়ছে কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হচ্ছে না। চিৎকার করতে করতে সে তার গলা ভেঙ্গে ফেলেছে!

প্রেসিডেন্ট চলে যাবার পরও আমাকে বেশ কিছুক্ষণ প্যান্ডেলে থাকতে হলো। রাগী রাগী চেহারার বুড়ো মানুষগুলো সবাই এসে আমার সাথে কথা বলল, আমার নাম-ঠিকানা কাগজে লিখে নিল। সাংবাদিকরা আমার সাথে কথা বলল, আমি কী করি, কী খাই, কী পরি এরকম নানা রকম প্রশ্ন করলো। টেলিভিশনের লোকেরা আমার ইন্টারভিউ নিলো। কয়েকজন মা তাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে আমার পাশে দাঁড় করিয়ে ছবি নিলেন। প্রায় আমাদের বয়সী কয়েকটা মেয়ে তাদের খাতায় আমার অটোগ্রাফ নিয়ে আমার টেলিফোন নম্বর জানতে চাইলো। আমি টেলিফোন নম্বর দেবার সাহস করলাম না। জয়ন্ত, মামুন, মৌটুসি আর আমাদের স্কুলের অন্যেরাও আমার আশেপাশে দাঁড়িয়ে রইলো। তারা এমন ভাব করতে লাগলো যেন তারা সব সময়েই জানতো আমি অসাধারণ প্রতিভাবান। সাংবাদিকেরা যখন তাদের ইন্টারভিউ নিলো তারা বানিয়ে বানিয়ে আমার সম্পর্কে অনেকগুলো ভাল ভাল কথা বলে ফেললো!

বেচারি প্রিয়াংকা শুধু একটা কথাও বলতে পারল না। তার গলা দিয়ে একটা শব্দও বের হচ্ছে না।

আমি যখন বাসায় ফিরে এসেছি তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি সাবধানে বাসার ভিতরে ঢুকলাম, আম্মু বসার ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। সামনে টেলিভিশনটা খোলা, কিছু একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, আপু সেটা দেখছে। ভাইয়া মনে হয় তার ঘরে।

আমি নিঃশব্দে রান্নাঘরে এসে ঢুকলাম, দুলি খালা রান্না করছিল, মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল। আমি দুলি খালার কাছে গিয়ে পকেট থেকে আমার গোল্ড মেডেলটা বের করে দেখালাম, বললাম, "এই দেখো দুলি খালা।"

"এইটা কী?"

"মেডেল।"

"কই পাইছ?"

"আমাকে দিয়েছে।"

"কে দিল?"

"প্রেসিডেন্ট।"

দুলি খালা কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কুন জায়গার প্রেসিডেন্ট?"

"কোন জায়গা মানে কী? বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট!"

স্বয়ং বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আমাকে একটা মেডেল দিয়েছেন শুনেও দুলি খালার খুব একটা ভাবান্তর হলো না। সে মেডেলটা হাতে নিয়ে বলল, "কীসের মেডেল এইটা? পিতলের?"

আমি হেসে বললাম, "ধুর দুলি খালা! পিতল হবে কেন? এইটা সোনার মেডেল!"

"আসল সোনা?"

"হ্যাঁ। আসল। একটা দেশের প্রেসিডেন্ট কখনো নকল সোনা দেয় নাকী?"

দুলি খালার এইবার চোখ বড় বড় হয়ে গেলো। মেডেলটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো, কতটুকু ওজন অনুমান করে বলল, "দুই ভরির কম না। কমপক্ষে দশ হাজার টাকা!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। সোনার কতো দাম তুমি জানো?"

দুলি খালা মেডেলটা হাতে নিয়ে নানা ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো এবং খাঁটি সোনা আর নকল সোনার পার্থক্য কীভাবে ধরতে হয় সেটা নিয়ে কথা বলতে লাগলো। কেন এই মেডেলটা পেয়েছি জানার খুব এটা আগ্রহ দেখালো না। এক দিক দিয়ে ভাল, যদি আগ্রহ দেখাতো তাহলে দুলি খালাকে সেটা বোঝাতে পারতাম বলে মনে হয় না! নাচের কম্পিটিশন হয়, গানের কম্পিটিশন হয় এমন কী কবিতা আবৃত্তির কম্পিটিশন হয়। তাই বলে গণিতের কম্পিটিশন?

স্টোররুমে আমি আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে সার্টিফিকেটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। মেডেলটা হাতে নিয়ে দেখলাম, তারপর সেগুলো তোশকের নিচে রেখে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলাম। আম্মু, ভাইয়া কিংবা আপু কিছুই জানে না। কালকে নিশ্চয়ই খবরের কাগজে খবরটা ছাপা হবে, সেই খবরটা পড়ে আম্মু কী করবে? ভাইয়া আর আপুইবা কী করবে? তাদের সবার ধারণা আমি একজন অপদার্থ খারাপ ছেলে। আমাকে দিয়ে কিছু হবে না! খবরের কাগজে যখন দেখবে বাংলাদেশে আমার মতো গণিত কেউ জানে না—আমি হচ্ছি চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন তখন তারা কী করবে?

আমার সেই ছোটবেলার কথা মনে হলো। স্কুল থেকে ডিবেটের টিম গিয়েছে, আমিও আছি সেই টিমে! আম্মু আমাকে নিয়ে গেছেন, বসেছেন দর্শকদের সাথে। ডিবেটে যখন আমাদের টিম জিতে গেলো তখন আম্মুর সে কী হাততালি। মেডেলটা নিয়ে যখন এসেছি আম্মু আমাকে ধরে সবার সামনে দুই গালে চুমু খেয়ে ফেললেন! বাসায় যখনই কেউ এসেছে সাথে সাথে তাদের আমার সেই মেডেলটা দেখিয়েছেন, এখন আমি বাংলাদেশের গণিত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, দেশের প্রেসিডেন্ট আমাকে একটা গোল্ড মেডেল দিয়েছে কিন্তু আমি সেটা আম্মুকে বলতে পারছি না।

আম্মু আর আপু বসার ঘরে বসে টেলিভিশন দেখছিল। এখন ভাইয়ার গলাও শুনতে পাচ্ছি, তিনজনে মিলে টেলিভিশনে খবর শুনছে। আজকে মনে হয় ক্রিকেট খেলা ছিল, ক্রিকেট খেলা নিয়ে বাসার সবার খুব উৎসাহ। যখনই ক্রিকেট খেলা হয় তখন সবাই মিলে সেটা দেখে। আমি অন্যমনস্কভাবে বসার ঘর থেকে টেলিভিশনের খবরের ছিটে ছোটা শুনছিলাম হঠাৎ ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠলাম। টেলিভিশনে আজকের গণিত প্রতিযোগিতার কথা বলছে! আমি পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত চলে এলাম ভাল করে শোনার জন্যে। দুলি খালা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো, আমি ফিসফিস করে বললাম, "দুলি খালা, টেলিভিশনে আমাদের খবর বলছে।"

দুলি খালা তখন চুলো থেকে ডেকচিটা নামিয়ে হাত মুছে তাড়াতাড়ি বসার ঘরে গেলো খবর শুনতে। আমি দরজায় কান লাগিয়ে খবরটা শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম। আবছা আবছা শুনতে পেলাম খবরে বলছে, "এই গণিত প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে প্রায় দেড় হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি বলেন, আজকের শিশু-কিশোররাই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কর্ণধার। তারাই একদিন বড় বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ হয়ে এই দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এই গণিত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে একমাত্র স্বর্ণপদকটি পেয়েছে হয় বি.কে. হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আরিফুল ইসলাম তপু।" খবর এক মুহূর্তের জন্যে থেমে যায় এবং অনেক মানুষের হাততালি শোনা যেতে থাকে, এখন নিশ্চয়ই দেখাচ্ছে আমাকে গোল্ড মেডেলটি দেয়া হচ্ছে! ইস! আমি যদি একবার দেখতে পারতাম!

আবার কথা শোনা যেতে লাগলো, "অনুষ্ঠান শেষে একান্ত সাক্ষাৎকারে আমাদের ক্ষুদে গণিতবিদ আরিফুল ইসলাম তপু জানান" আমি তখন হঠাৎ করে আমার নিজের গলার স্বর শুনতে পেলাম, আমি বলছি, "না মানে আমি কখনই ভাবি নাই আমি চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন হব। সবাই ছয়টা সাতটা করে অঙ্ক করেছে আমি করেছি মাত্র একটা! আমি বুঝি নাই আমি যেটা করেছি সেটা ছিল সবচেয়ে কঠিন। তবে অঙ্কটা কঠিন হলেও খুব মজার অঙ্ক ছিল। আমার করতে খুব মজা লেগেছে।" আমার কথা যখন বলেছে তখন টেলিভিশনে নিশ্চয়ই আমাকে দেখিয়েছে— কেমন দেখাচ্ছিল কে জানে! ইস যদি একবার দেখতে পারতাম!

টেলিভিশনে আবার কথা শোনা যেতে লাগলো, "আমাদের ক্ষুদে গণিতবিদ আরিফুল ইসলাম তপু জানিয়েছে সে বড় হয়ে একজন সত্যিকার গণিতবিদ হতে চায়। সে জানায় তার সাফল্যের পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে তার বন্ধুবান্ধব, তার স্কুলের শিক্ষক এবং অবশ্যই তার পরিবারের সদস্যরা।"

খবরের মানুষটি বলল, "এবারে খেলার খবর।" তখন একটা বাজনা বাজতে লাগলো- এখন মনে হয় বিজ্ঞাপন শুরু হয়ে যাবে।

আমি কিছুক্ষণ রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম, বসার ঘর থেকে আম্মু ভাইয়া বা আপুর কোন কথা শোনা যায় কী না সেটা শুনতে। কিন্তু কিছু শুনতে পেলাম না। সবাই নিঃশব্দে বসে আছে- এই মুহূর্তে কী ভবছে তারা? আমি নিঃশব্দে আবার স্টোররুমে আমার বিছানায় ফিরে এলাম।

অন্যদিন খাবার টেবিলে আম্মু ভাইয়া আর আপু হালকা গলায় একটু কথাবার্তা বলে আজকে আমি এটা কথাও শুনতে পেলাম না, একেবারে নিঃশব্দে তারা খেয়ে উঠে গেলো। আমি শুনতে পেলাম সবাই নিজের নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছে।

ঠিক আধাঘণ্টা পরে বাসার কলিংবেল বেজে উঠল। আমাদের বাসায় খুব বেশি কেউ আসে না– আম্মুর অফিসের লোকজন, ভাইয়া বা আপুর দুই একজন বন্ধুবান্ধব মাঝে মাঝে আসে। তারা অবশ্যি আরো আগে আসে– এখন একটু বেশি রাত হয়ে গেছে। কলিংবেল শুনে দুলি খালা দরজা খুলে দিয়েছে, আমি একজন মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম কে এসেছে, কার কাছে এসেছে। কিছু বোঝার আগেই আমি পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, রান্নাঘর হয়ে স্টোররুমে যে এসে হাজির তাকে দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম, আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম। ম্যাডামের হাতে একটা বিশাল ফুলের তোড়া।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম স্টোররুমে এসে চালের বস্তাটা ঠেলে সরিয়ে একটু জায়গা করে নোংরা মেঝেতে বসে পড়লেন। তাকে দেখে মনে হলো স্টোররুমের ছোট ঘুপচিতে ময়লা তোষক বিছিয়ে গুটিশুটি মেরে একজনের ঘুমানো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার— আর ফুলের তোড়া নিয়ে তার সাথে দেখা করতে আসা আরো স্বাভাবিক ব্যাপার। ম্যাডাম ফুলের তোড়াটা আমার বিছানায় রেখে বললেন, "টেলিভিশনে এই মাত্র তোমাকে দেখেছি! আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার মেডেলটা আমাকে দেখাও, নিজের চোখে না দেখলে আমার বিশ্বাস হবে না।"

আমি তখনও থতমত খেয়ে আছি। কী হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কেমন করে আমার বাসায় এতো রাতে চলে এলেন, কেন এলেন? বাসার কারো সাথে কথা না বলে এই স্টোররুমে কেন চলে এলেন! আমাদের এভাবে দেখে একটুও অবাক কেন হচ্ছেন না– কেন ভান করছেন এটাই স্বাভাবিক? আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "ম্যাডাম-আ-আপনি আমার বাসা চিনলেন কেমন করে ম্যাডাম?"

"যতদিন আমাদের ভ্রাম্যমাণ এনসাইক্লোপিডিয়া প্রিয়াংকা আছে ততদিন তোমার বাসা চেনা কোন সমস্যা নাকী?" প্রিন্সিপাল ম্যাডাম শব্দ করে হেসে বললেন, "আজ বিকেলে সে আমার বাসায় হাজির! শুধু লাফঝাঁপ দেয় আর ঠোঁট নাড়ায়– গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হয় না! শুধু ফ্যাস ফ্যাস করে শব্দ

হয়! অনেক কষ্ট করে আমাকে বুঝিয়েছে। তার সাথে বসে টেলিভিশনের নিউজ দেখে এখন আসছি!”

হঠাৎ করে আমার অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কেন সোজা স্টোররুমে চলে এলেন, কেন আমাকে ময়লা তোষকের মাঝে গুটিশুটি মেরে বসে থাকতে দেখেও অবাক হলেন না– সব আমি বুঝে গেলাম। আমি নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, “প্রিয়াংকা কোথায় ম্যাডাম?”

“বাইরে ঘোরাঘুরি করছে! ভিতরে আসতে রাজি হলো না।”

আমি বললাম, “ও।”

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমার মাথায় হাত রাখলেন, তারপর নরম গলায় বললেন, “তপু, তুমি একা একা অনেক দূর চলে এসেছ। এরকম আমি কখনো দেখি নি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমার আর একা একা যেতে হবে না। আমরা সবাই থাকব তোমার সাথে।”

আমি কোন কথা বললাম না। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম উঠে দাঁড়ালেন, তারপর স্টোররুম থেকে বের হয়ে গেলেন। বাইরে নিশ্চয়ই আম্মুর সাথে দেখা হলো কারণ শুনলাম প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বললেন, “আপনি নিশ্চয়ই তপুর আম্মু? আমরা সবাই তপুকে নিয়ে খুব গর্বিত। এমন একটি সন্তানকে আপনি জন্ম দিয়েছেন— আপনি হচ্ছেন রত্নগর্ভা।”

আম্মু কিছু বললেন না। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বললেন, “অসময়ে আপনাদের বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না। খবরটা শুনে আর বাসায় থাকতে পারলাম না।"

আম্মু এবারে অস্পষ্ট গলায় কী যেন বললেন। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বললেন, “আসি তাহলে?”

দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলাম– প্রিন্সিপাল ম্যাডাম নিশ্চয়ই চলে গেলেন। আমি দীর্ঘ সময় নিঃশব্দে আমার ঘরে বসে রইলাম, আমার শুধু মনে হতে লাগলো এক্ষুণি হয়তো আম্মু আমার ঘরে আসবেন– কিছু একটা বলবেন, কিন্তু আম্মু আসলেন না।

গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমি চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি আবছা অন্ধকারে আম্মু আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আম্মুর হাতে একটা লোহার রড—হঠাৎ করে আমার বুকটা ধ্বক করে উঠল। আম্মুর চুল এলোমেলো,

চোখগুলো অন্ধকারেও ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে। আম্মু হিংস্র গলায় বললেন, "তোর সাহস বেশি হয়েছে তপু?"

আম্মু কিসের সাহসের কথা বলছেন আমি বুঝতে পারলাম না, তাই সব সময় যেটা করি সেটাই করলাম। একটা কথাও না বলে চুপ করে বসে রইলাম। আম্মু বললেন, "টেলিভিশনে বলেছিস তোর ফেমিলির সবাই তোকে পড়াশোনায় উৎসাহ দেয়?"

"আমি সেটা বলেছি! টেলিভিশনের লোকেরা আমার কাছে সেটাই শুনতে চেয়েছিল তাই বলেছি। আম্মু দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, "তুই আমাদেরকে নিয়ে টেলিভিশনে টিটকারি মারিস? তোর এতো বড় সাহস? আমি তোকে খুন করে ফেলব আজকে?"

আম্মু হাতের রডটা উপরে তুললেন, আমি কখনো আম্মুর সাথে কথা বলি না, নিঃশব্দে মার খেয়ে যাই। আজকে কী হলো জানি না আমি হঠাৎ কথা বলতে শুরু করলাম, বললাম, "আম্মু!"

"কী বলতে চাস?"

"আসলেই আমি তোমার কাছ থেকে উৎসাহ পাই আম্মু।"

"আমার কাছ থেকে উৎসাহ পাস? আমি কী করেছি তোর জন্যে যে তুই উৎসাহ পাস?" আম্মু রডটা ঝাঁকালেন, আমি জানি, এক্ষুণি আমার মাথায় নেমে আসবে সেটা।

আমি কাতর গলায় বললাম, "আমি যখন ছোট ছিলাম তখন তুমি আমাকে কতো আদর করতে মনে আছে? আমার যখন মন খারাপ হয় তখন আমি সেই সময়ের কথা ভাবি আর আমার মন ভাল হয়ে যায়! আমি এখনোও সেই সময়ের কথা চিন্তা করে উৎসাহ পাই আম্মু।"

আম্মু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি ফিসফিস করে বললাম, "এখন তুমি আমাকে যাই কর না কেন– ছোট থাকতে আমাকে যে আদর করেছিলে সেটা কেউ আমার কাছ থেকে নিতে পারবে না। বিশ্বাস করো তুমি।"

আম্মু কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর নিঃশব্দে লোহার রডটা নামিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

আমি চুপচাপ আমার বিছানায় বসে রইলাম। এর আগে সবসময় আমার নিজের জন্যে মায়া হয়েছে— আজকে কী হলো কে জানে হঠাৎ করে আমার আম্মুর জন্যে মায়া হতে শুরু করল।

বন্ধু এবং বন্ধু

আমি যখন পরদিন স্কুলে গেলাম তখন ক্লাসের সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল– আমাকে কেউ বলে দেয় নি কিন্তু আমি দেখেই বুঝতে পারলাম আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, কোন সন্দেহ নেই যে সবচেয়ে জোরে চিৎকার করছে প্রিয়াংকা, কিন্তু তার গলায় এখনো কোন শব্দ নেই। মোটাসোটা কয়েকজন আমাকে কীভাবে কীভাবে জানি ঘাড়ে তুলে ফেলল। অন্যেরা আমাকে ঘিরে লাফাতে লাগলো। মৌটুসি কোথা থেকে জানি কয়েকটা ফুল নিয়ে এসেছে, সেগুলো ছিঁড়ে পাপড়িগুলো সবাই মিলে আমার ওপর ছিটাতে শুরু করলো। আমি মেডেলটা পকেটে করে নিয়ে এসেছিলাম, সেটা টের পেয়ে জয়ন্ত পকেট থেকে বের করে নিয়ে এসেছে, সবাই সেটা গলায় দিয়ে লাফালাফি করতে লাগলো! সেখানেই শান্ত হলো না, আমাকে ঘাড়ে নিয়ে তারা স্কুলের মাঠে চলে গেলো, সেখানে কয়েকজন আমাকে ঘাড়ে নিয়ে স্কুলের মাঠে চক্কর দিতে লাগলো– অন্যেরা চিৎকার করতে করতে পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলো। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ হলো সবচেয়ে বেশি তারা পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলো আর চিৎকার করে বলতে লাগলো, "অঙ্ক ভাই, অঙ্ক ভাই, অঙ্ক ভাই অঙ্ক ভাই..." চেঁচামেচি হৈচৈ শুনে স্যার আর ম্যাডামরা বের হয়ে এলেন, বের হয়ে এই দৃশ্য দেখে সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন।

স্কুলের এসেম্বলিতে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম গণিত প্রতিযোগিতা নিয়ে দুই একটি কথা বললেন। তখন ক্লাস থ্রির যে মেয়েটা পুরস্কার পেয়েছে তাকে আর আমাকে সামনে ডেকে আনা হলো। স্কুলের দপ্তরি কয়েকটা খবরের কাগজ নিয়ে দাড়িয়ে ছিল, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম সেখান থেকে কিছু কিছু জায়গা পড়ে শোনালেন। আমার জন্যে সারা দেশে আমাদের স্কুলের সুনাম কেমন বেড়ে গেছে সেটা বলার পর সবাই হাততালি দিতে লাগলো। আমি আড়চোখে রাজাকার স্যারকে দেখার চেষ্টা করলাম, মাত্র কয়দিন আগেই রাজাকার স্যার

টি.সি. দিয়ে আমাকে বিদায় করে দেবার কথা বলেছিলেন, তা না হল নাকী পুরো স্কুলের বেইজ্জতি হবে! এখন রাজাকার স্যার কী বলবেন?

গণিত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন হবার পর একেবারে ম্যাজিকের মতো স্কুলে আমার অবস্থাটা পাল্টে গেলো। আগে আমাকে দেখলে ছেলে-মেয়েরা দূরে সরে যেতো, এখন আমাকে দেখলেই সবাই দাঁত বের করে হেসে বলে, "কী খবর আইনস্টাইন? আজকে কোন কিছু আবিষ্কার হলো?" আমি তাদের অনেকবার বলেছি আইনস্টাইন হচ্ছেন একজন বৈজ্ঞানিক- গণিতবিদ না, কিন্তু কোন লাভ হয় নাই। আগে মেয়েরা আমাকে রীতিমতো ভয় পেতো, চোখ পাকিয়ে কারো দিকে তাকালেই মনে হতো এখনই ভ্যাঁ করে কেঁদে দিবে। এখন আমাকে ভয় তো পায়ই না উল্টো আমার সাথে গল্প করার জন্যে চলে আসে! এলজ্যেবরা জ্যামিতি বা ত্রিকোণমিতির কোন কিছু না বুঝলেই এখন তারা আমার কাছে চলে আসে, আমাকে সেগুলো বুঝিয়ে দিতে হয়। মেয়েগুলি দুষ্টুও কম না, বেশি সময় থাকার জন্যে অনেক সময় বুঝেও না বোঝার ভান করে! তবে সবচেয়ে মজা হয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে- তাদের ধারণা আমি ভাল অঙ্ক জানি, তার মানে আমি নিশ্চয়ই বড় বড় গুণ করতে পারি। দেখা হলেই বলে, "অঙ্ক ভাই, অঙ্ক ভাই, সাতশ' তেইশ আর নয় হাজার চব্বিশ গুন করলে কতো হয়?"

আমার মাথায় যেটা আসে সেটাই বলে দিই, "পঁয়ষট্টি লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশ' বাহান্ন।" উত্তরটা ভুল হলো না শুদ্ধ হলো সেইটা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, কিছু একটা উত্তর পেলেই তারা খুশি!

স্কুলের স্যারেরাও আমাকে আজকাল একটু ভাল চোখে দেখেন। সবচেয়ে মজা হয়েছিল সেদিন জ্যামিতি ক্লাসে, স্যার ক্লাসে এসে বললেন, "আমার খুব একটা জরুরি কাজ পড়ে গেছে রে! তপু তুই ক্লাসটা নিতে পারবি না?"

আমি বললাম, "পারব স্যার। কিন্তু কেউ আমার কথা শুনবে না, খালি আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।"

স্যার বললেন, "করে দেখুক। আমি টেনে কল্লা ছিঁড়ে ফেলব না!"

স্যার টেনে কল্লা ছিঁড়ে ফেলবেন শোনার পরেও সবাই হাসাহাসি করলো কিন্তু তার মাঝেই আমি জ্যামিতি ক্লাসটা নিয়ে নিলাম। কঠিন কঠিন কয়েকটা উপপাদ্য বুঝিয়ে দিলাম। আমার মনে হয় সবাই বেশ ভালই বুঝেছে। দিলীপকেও দেখলাম কয়েবার মাথা নাড়ল।

আমার এরকম নতুন জীবন শুরু হওয়ায় সবচেয়ে খুশি হয়েছে প্রিয়াংকা! তার ভাঙ্গা গলা ঠিক হতে পাকা এক সপ্তাহ লেগে গেলো, কাজেই সে যে কীভাবে আমাকে আবিষ্কার করে গণিত প্রতিযোগিতায় নিয়ে গেছে এবং আমাকে চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ফেলেছে এবং এই ব্যাপারটাতে পুরো কৃতিত্বটাই যে তার এবং আমার কোনই কৃতিত্ব নই সে বিষয়টা সবার শুনতে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হলো। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হতে লাগলো আমি যেন কোরবানির গরু এবং আমার নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং সবাইকে বলছে যে এরকম মোটাতাজা কোরবানির গরুটা কিনে আনার পুরো কৃতিত্বটাই তার! তবে প্রিয়াংকাকে সবাই পছন্দ করে, কাজেই সবাই তার সব কথা মেনে নেয়। আর এটা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে প্রিয়াংকার আগে কেউ কোন দিন আমার সাথে ভাল করে কথাও বলে নি! সত্যিই সে আমাকে আবিষ্কার করেছে।

ক্লাসের কেউ আমার সাথে আম্মু নিয়ে কথা বলে না কিন্তু আমার ধারণা কীভাবে কীভাবে সবাই আসল ব্যাপারটা জেনে গেছে। কিন্তু আমার ধারণা এখানেও প্রিয়াংকার একটা হাত আছে, সে সবাইকে বলে রেখেছে কেউ যদি ভুলেও আমার সাথে আম্মু নিয়ে কথা বলে তাহলে সে পিটিয়ে তাদের হাঁটুর মালাই চাকি খুলে রাখবে।

শুধু বাসাতে আমার জীবন মোটামুটি আগের মতোই থেকে গেল। একেবারে কিছু পরিবর্তন হয় নাই তা নয়, আমাকে আর বাথরুম ধুতে হয় না, দুলি খালাকে রান্নাবান্নায় সাহায্যও করতে হয় না। আগে স্কুলে বেতনের জন্যে অনেক আগে থেকে আপুর পিছনে পিছনে ঘুরতে হতো, এখন আপু নিজেই একটা খামে করে বেতনের টাকাটা দিয়ে যায়। অথচ মজার ব্যাপার হলো আমাকে স্কুলে আর বেতন দিতে হয় না। শুধু যে বেতন দিতে হয় না তা নয় উল্টো আমাকে মাসে মাসে তিনশ' টাকা বৃত্তি দেয়া হয়। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমাকে ডেকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন আমি টিউশানি করাতে রাজি আছি কী না। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে একটা ভাল ছাত্র ম্যাথমেটিক্সের একটা টিউটর খুঁজছে। যদি এই টিউশানিটা পেয়ে যাই তাহলে প্রতি মাসে কমপক্ষে নিশ্চয়ই দুই হাজার টাকা করে পাব। ইংলিশ মিডিয়ামে যারা পড়ে তাদের কাছে টাকা নাকী হাতের ময়লা!

প্রিয়াংকা আগের মতোই আছে। এখনো সে গোপনে 'বিক্ষিপ্তভাবে আনন্দ বিতরণ' করে যাচ্ছে! এগুলো গোপনীয় হলেও সে মাঝে মাঝে আমাকে বলে। আমি তার সাথে যেতে চাইলে আমাকে নিয়েও যায়। একদিন একটা থুত্থুড়ে

বুড়োকে একটা দাবার বোর্ড আর ঘুঁটির প্যাকেট দিয়ে ফিরে আসছে, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, "তুই যে এভাবে একলা একলা জায়গায়-অজায়গায় ঘুরে বেড়াস তোর বাসা থেকে কিছু বলে না?"

প্রিয়াংকা রেগে বলল, "আমি মোটেও জায়গায়-অজায়গায় ঘুরে বেড়াই না।"

"আচ্ছা ঠিক আছে- ঠিক আছে!" আমি নিজেকে শুদ্ধ করে বললাম, "তুই যে একলা একলা নানারকম ইন্টারেস্টিং জায়গায় ঘুরে বেড়াস- তোকে বাসা থেকে কিছু বলে না?"

"উঁহুঁ।"

"তোর আব্বু-আম্মু দুজনেই তোকে এভাবে ঘুরে বেড়াতে দেয়?"

"আমার আম্মু নেই।"

"ও।" আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। ইতস্তত করে বললাম, "তোর আব্বু?"

"আব্বু আছেন।"

"ও।"

আমরা দুজন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটলাম। একসময় প্রিয়াংকা বলল, "আমার বাসার কাছাকাছি চলে এসেছি। যাবি?"

আমি তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই। জিজ্ঞেস করলাম, "তোর আব্বু কী বাসায় আছেন?"

"আছেন। সব সময়ে থাকেন।"

"আ-আমাকে দেখে রাগ হবেন না তো?"

প্রিয়াংকা হি হি করে হাসলো, বলল, "ধুর গাধা, রাগ হবেন কেন?"

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, "না মানে ইয়ে—"

আমরা আরো কিছুক্ষণ হাঁটলাম, সরু একটা রাস্তার পাশে পুরানো একটা বাসার সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয়াংকা বলল, "এই যে আমাদের বাসায় এসে গেছি।"

আমি বললাম, "ও।"

প্রিয়াংকা দরজায় শব্দ করল। কয়েক মিনিট পরে ঘুট করে শব্দ করে দরজা খুলে গেলো। আমি দেখলাম হুইল চেয়ারে বসে থাকা একজন মানুষ। মানুষটার চেহারা খুব সুন্দর, এক মাথা কালো চুল, কানের কাছে সেই চুলে পাক ধরেছে। চোখে পাতলা ধাতব রিমের একটা চশমা। প্রিয়াংকা একটু আগে বলেছিল তার আব্বু সবসময় বাসায় থাকেন, এখন তাকে দেখে বুঝতে পারলাম কেন। হুইল চেয়ারে করে কোথায় আর যাবেন?

প্রিয়াংকা বলল, "আব্বু, দেখো একজন গেস্ট এসেছে।"

প্রিয়াংকার আব্বু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের বিখ্যাত গণিতবিদ?"

"হ্যাঁ, আব্বু।"

"ভেরি গুড। এসো তপু এসো। প্রিয়াংকার কাছে তোমার অনেক গল্প শুনেছি। পত্রিকায় তোমার ছবি দেখে ভেবেছিলাম তুমি আরো বড়! তুমি তো আসলে অনেক ছোট।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। প্রিয়াংকা নিজের জুতো খুলে খালি পায়ে ভেতর থেকে একটু ঘুরে এসে বলল, "তপু, আমার আব্বু হচ্ছেন একজন লেখক।"

আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, "সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যিকার লেখক।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী নাম।"

প্রিয়াংকা হি হি করে হাসল, বলল, "নাম বললে তুই চিনবি না। আসলে কেউই চিনবে না। আব্বু দুই তিন বছর পরিশ্রম করে যে বই লিখে সেটা ছাপা হয় দশ কপি। যে ছাপায় সে কিনে পাঁচ কপি আর আব্বু কিনে পাঁচ কপি!"

প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "সেই পাঁচ কপি কিনে তোর আব্বু কী করে সেটাও বলে দে।"

"বাসায় যদি কেউ আসে জোর করে তাকে একটা কপি ধরিয়ে দেয়। আজকে তুই এসেছিস তোকেও আব্বুর বইয়ের এক কপি নিয়ে যেতে হবে দেখিস!"

আমি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে প্রিয়াংকা আর তার আব্বুর দিকে তাকিয়ে রইলাম, দেখে মনে হচ্ছে দুইজন সমবয়সী বন্ধু কথা বলছে! আমার আব্বু যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমিও কী এভাবে কথা বলতে পারতাম?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কীসের ওপর বই লিখেন?"

প্রিয়াংকার আব্বু কথা বলার আগেই প্রিয়াংকা বলল, "তুই শুনলে বিশ্বাস করবি না। আব্বু যে সব বিষয়ের ওপর বই লিখে সেসব বিষয় যে আছে সেটাও তুই জানিস কী না সন্দেহ আছে!"

প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "ব্যস অনেক বাপের বদনাম করা হয়েছে। এখন তোর বিখ্যাত বন্ধুর জন্য চা-নাস্তা কিছু নিয়ে আয়।"

প্রিয়াংকা বলল, "আনছি বাবা আনছি।"

প্রিয়াংকা রান্নাঘরের দিকে চলে যাবার পর প্রিয়াংকার আব্বু আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, "আমার বইগুলো হচ্ছে অবলুপ্ত প্রাণীদের ওপর।"

"অবলুপ্ত প্রাণী?"

"হ্যাঁ। আমাদের এই অঞ্চলে এক সময় গণ্ডার থাকতো তুমি জানো?"

আমি জানতাম না, তাই অবাক হয়ে তাকালাম। প্রিয়াংকার আব্বু বললেন "শুধু গণ্ডার না, এখানে বনরুই বলে একটা প্রাণী থাকতো, নীল গাই নাম এক ধরনের প্রাণী থাকতো এখন সব অবলুপ্ত হয়ে গেছে, না হয় অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম প্রাণীগুলো যখন থাকবেই না অন্তত তার ইতিহাসটা বেঁচে থাকুক। কী বলো?"

আমি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লাম। আমি এখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি প্রিয়াংকা কেমন করে প্রিয়াংকা হয়েছে! তার আব্বু আমার সাথে এমন ভাবে কথা বলছেন যেন আমি একজন বড় মানুষ। প্রিয়াংকার সাথেও নিশ্চয়ই এভাবে কথা বলেন, তাই প্রিয়াংকা নিজে বোঝার আগেই বড় হয়ে গেছে। তার কথাবার্তা, চালচলন সব বড় মানুষের মতো। আমি আড়া চোখে কয়েকবার প্রিয়াংকার আব্বুর দিকে তাকালাম, হুইল চেয়ারে তার পাগুলো দেখে মনে হয় না সেখানে কোন সমস্যা আছে- কিন্তু আসলে নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে হুইল চেয়ারে কেন? কী হয়েছিল কে জানে!

কিছুক্ষণের মাঝেই প্রিয়াংকা চানাচুর আর চা নিয়ে এলো। এইটুকুন সময়ের মাঝে চানাচুরগুলো কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ দিয়ে মাখিয়ে নিয়ে এসেছে। ছোট একটা টেবিল ঘিরে আমরা বসেছি- আমি আর প্রিয়াংকা চেয়ারে, প্রিয়াংকার আব্বু হুইল চেয়ারে। চা খেতে খেতে প্রিয়াংকা কথা বলতে লাগলো- প্রিয়াংকার আব্বু এক সময় তাকে থামালেন, বললেন, "প্রিয়াংকা তোর কথা তো প্রত্যেক দিনই শুনি- আজকে তোর গেস্টের মুখ থেকে কিছু শুনি।"

প্রিয়াংকা হি হি করে হেসে বলল, "তাহলেই হয়েছে। আমাদের তপু মাত্র তিনটা শব্দ জানে। একটা হচ্ছে 'ও', আরেকটা 'আচ্ছা' আর আরেকটা 'তাই নাকী!' তাই তুমি যদি তপুর কথা শুনতে চাও এই তিনটাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।"

প্রিয়াংকার আব্বু হেসে বললেন, "ঠিক আছে, এই তিনটাতেই না হয় সন্তুষ্ট থাকব, কিন্তু তার মুখ থেকে শুনে সন্তুষ্ট থাকি!'

প্রিয়াংকার আব্বু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "খবরের কাগজে তোমার সম্পর্কে যেটা লিখেছে সেটা পড়ে মনে হলো তুমি হয়তো একটা ইয়াং প্রডিজি।

প্রডিজি কী জানো তো– খুব কম বয়সে যাদের মেধার অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটে তাদেরকে বলে প্রডিজি।"

আমি অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলাম, "না— সেরকম কিছু না!"

"তোমার বিনয় করার প্রয়োজন নেই। দেখা গেছে গণিত সঙ্গীত এসব বিষয়ে মেধা সাধারণত খুব কম বয়সে বিকশিত হয়।"

আমি বললাম, "ও।"

"আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে তো?"

"কন্ট্রোল?"

"হ্যাঁ।" প্রিয়াংকার আব্বু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "আমার মেয়ে তোমাকে রাতারাতি বিখ্যাত বানিয়ে ফেলে মহাখুশি। আমার প্রশ্ন হলো সেটা তোমার জন্যে কী ভাল হলো, নাকী খারাপ হলো?"

প্রিয়াংকা ঠকাস কার কাপটা টেবিলে রেখে বলল, "কী বলছ তুমি আব্বু? এটা আবার খারাপ হবে কেমন করে?"

"আমি সেটাই বলার চেষ্টা করছি। খ্যাতি খুব বিচিত্র একটা জিনিস। এটা লটারির মতো– অনেক চেষ্টা করেও এটা পাওয়া যায় না। যারা পাবার তারা এমনিতেই পায়। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানিস?"

"কী?"

"বেশিরভাগ সময়ে খ্যাতিটা অপাত্রে যায়। যারা পায় তারা সেটা ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না।"

প্রিয়াংকা বলল, "বুঝলি তপু, এই জন্যে আমাদের বাসায় কেউ আসতে চায় না। আসলেই আব্বু এমন জ্ঞানের কথা শুরু করে দেয় যে সে কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালায়।"

প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "বাজে কথা বলবি না। আজকে প্রথম তুই একজন বিখ্যাত মানুষ এনেছিস। এর আগে বিখ্যাত কেউ এসেছে?"

আমি অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসে বললাম, "আমি মোটেও বিখ্যাত না–"

প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "কিন্তু তোমার ভেতরে বিখ্যাত হবার সবগুলো এলিমেন্ট আছে। সে জন্যে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যদি কখনো খ্যাতি এসে তোমার হাতে ধরা দেয়, তুমি সেটা কন্ট্রোল করতে পারবে?"

আমি এই প্রশ্নের কী উত্তর দেব সেটা বুঝতে পারলাম না। মথা চুলকে বললাম "এ্যাঁ, এ্যাঁ-এ্যাঁ-"

প্রিয়াংকা হি হি করে হেসে বলল, "তপুর তিন শব্দের সাথে চার নম্বর শব্দ যোগ হলো সেটা হচ্ছে এ্যাঁ!"

প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "আসলে এইটুকুন ছেলেকে অনেক বড় প্রশ্ন করে ফেলেছি তো– উত্তর দেবে কী ভাবে?"

আমি বললাম, "আপনি উত্তরটা দিয়ে দেন!"

"আমি দিলে সেটা তো আমার উত্তর হবে তোমার উত্তর হবে না!"

আমি আবার মাথা চুলকে বললাম, "এ্যাঁ, এ্যাঁ এ্যাঁ..."

সেটা শুনে প্রিয়াংকা আবার হি হি করে হেসে ফেলল। প্রিয়াংকার আব্বুও একটু হাসলেন, হেসে বললেন, "আমার কয়েক জন খুব বিখ্যাত বন্ধু আছে, নাম বললে তোমরা চিনবে! আমি তাদেরকে খুব ভাল করে স্টাডি করেছি। করে কী দেখেছি জানো?"

"কী?"

"খ্যাতিটা গুরুত্বপূর্ণ না। যে গুণের জন্যে খ্যাতি এসেছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই মিছিমিছি খ্যাতির পিছনে ছুটতে হয় না। মানুষ তো একটামাত্র জীবন পায়, সেই জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে হয়। তাই বলছিলাম একজন বিখ্যাত মানুষ হয়ে বিশেষ লাভ নেই কিন্তু একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে অনেক লাভ–"

প্রিয়াংকা বলল, "এই জন্যে আমি বাসায় কাউকে আনতে চাই না। সুযোগ পেলেই তুমি উল্টাপাল্টা কথা বলে মাথা আউলাঝাউলা করে দাও।"

প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "ঠিক আছে, আর আউলাঝাউলা করব না। তার চাইতে আমার লাস্ট বইটা নিয়ে আয়, তপুকে দেখাই।"

"কোন জ্ঞানের কথা বলতে পারবে না কিন্তু।"

"ভয় পাস না, বলব না।"

প্রিয়াংকা তখন শেলফ থেকে তার আব্বুর লেখা বেশ কয়েকটা বই নামিয়ে আনল।

আমি যখন বিকালবেলা প্রিয়াংকার বাসা থেকে বের হচ্ছিলাম তখন সে আমাকে একটু এগিয়ে দিতে এলো। আমি যখন বললাম কোন দরকার নেই তখন সে বলল মোড়ের দোকান থেকে তার নাকী ডিম আর তেল কিনতে হবে।

রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আমি বললাম, "আচ্ছা প্রিয়াংকা, তোকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি?"

"আব্বু কেন হুইল চেয়ারে সেটা জিজ্ঞেস করবি তো?"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "হ্যাঁ।"

"আমি যখন ছোট তখন একটা গাড়ি একসিডেন্ট হয়েছিল। আম্মু স্পট ডেড। আব্বুর কোমর থেকে নিচে প্যারালাইজড।"

আমি কিছুক্ষণ প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "তোর সাথে আমার একটা মিল আছে দেখেছিস?"

"কী মিল?"

"আমার বেলায় একসিডেন্টে আব্বু স্পট ডেড, আম্মু প্যারালাইজড! তোর আব্বুর শরীর আর আমার আম্মুর মন!"

প্রিয়াংকা কোন কথা না বলে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল। আমি অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করতে লাগলাম, কোনটা ভাল? শরীর অবশ হয়ে যাওয়া নাকী মন অবশ হয়ে যাওয়া?

সারপ্রাইজ পার্টি

প্রিয়াংকা এটা ঠিক কীভাবে করে জানি না– আমাদের ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের যেদিন যার জন্মদিন সেদিন সে তার জন্যে একটা উপহার নিয়ে আসে। খুব যে একটা দামি উপহার আনে তা না– ছোটখাটো উপহার কিন্তু সে খুব ভাবনাচিন্তা করে সেটা আনে। জাবেদ হচ্ছে বইয়ের পোকা, তার জন্যে আনলো একটা বই এবং মজার কথা হচ্ছে এমন একটা বই যে বইটা জাবেদ পড়ার জন্যে অনেক দিন থেকে খুঁজছে এবং খুঁজে পাচ্ছে না। বইয়ের প্যাকেটটা খুলে সে যখন বইটা দেখলো তার মুখটা একেবারে একশ' ওয়াট বালবের মতো জ্বলে উঠল! আমি তখন বুঝতে পারলাম প্রিয়াংকা কেন এটা করে– একজন মানুষের মুখ যখন আনন্দে একশ' ওয়াট বালবের মতো জ্বলে ওঠে সেটা দেখার চাইতে মজার ব্যাপার আর কী আছে? আমাদের নীলিমা হচ্ছে একজন গায়িকা তার জন্যে প্রিয়াংকা আনলো একটা স্বরলিপির বই, বইটা পুরানো এবং পোকা খাওয়া। আমি ভেবেছিলাম এই বইটা দেখে নীলিমা নিশ্চয়ই একটু বিরক্ত হবে– হলো ঠিক তার উল্টো, খুশিতে লাফাতে লাগলো কারণ সেটাতে নাকী দ্বিজেন্দ্রলালের কোন একটা হারিয়ে যাওয়া গানের স্বরলিপি আছে! আমাদের ইশতিয়াক হচ্ছে ক্রিকেটের ভক্ত, দুনিয়ার সব ক্রিকেটারদের নামধাম তার মুখস্থ। তাকে দিলো একটা সাইবার ক্যাফের কুপন পিছনে একটা ওয়েব সাইটের ঠিকানা। ঠিকানার নিচে প্রিয়াংকা লিখে দিয়েছে এখানে পৃথিবীর সমস্ত ক্রিকেটের খবর আছে! ইশতিয়াক ইন্টারনেট সাইবার ক্যাফে এসব কিছুই জানতো না, আরেকজনকে নিয়ে সেটা দেখে একেবারে হতবাক হয়ে গেলো! সারা জীবনের জন্যে সে প্রিয়াংকার ভক্ত হয়ে গেলো সাথে সাথে।

প্রিয়াংকার এই 'বিক্ষিপ্তভাবে আনন্দ প্রদান পদ্ধতি'টা আমরা সবাই কম-বেশি টের পেতে শুরু করেছি। বিষয়টা মনে হয় একটু ছোঁয়াচে, ক্লাসের আরও অনেকে দেখি সেটা করতে শুরু করেছে। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ইংলিশ মিডিয়াম সেই ছাত্রটার জন্যে আমাকে প্রাইভেট টিউটর বানিয়ে দেয়ার পর মাসের শেষে আমি যখন আড়াই হাজার টাকা পেলাম আমার প্রায় মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার

অবস্থা হলো! আমিও তখন একটু 'বিক্ষিপ্তভাবে আনন্দ প্রদান' পদ্ধতি করার চেষ্টা করলাম- প্রিয়াংকা যেরকম অনেক দিন সময় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আমি সেরকম পারি না তাই আমি এরকম জটিল কিছু করার চেষ্টা করলাম না, ক্লাসের সবার জন্যে মোড়ের দোকান থেকে জিলিপি কিনে নিয়ে এলাম। সবাই যখন কাড়াকাড়ি করে জিলিপি খেলো এবং জিলিপির রসে কারো হাত কারো বই খাতা এবং কারো জামা-কাপড় আঠা আঠা হয়ে গেলো সেটাও কম মজার ব্যাপার হলো না।

তবে আমরা কেউ প্রিয়াংকাকে হারাতে পারলাম না, আমরা যখন 'বিক্ষিপ্তভাবে আনন্দ প্রদান'-এর চেষ্টা করি সেটা অনেক সময় হয়ে যায় জোর করে করা, সাজানো বা কৃত্রিম। প্রিয়াংকা যখন করে সেটা হয় একেবারে স্বাভাবিক। দেখতে দেখতে প্রিয়াংকা মেয়েটার জন্যে ক্লাসের সবার এতো মায়া হয়ে গেলো সেটা আর বলার নয়। সেটা আমি বুঝতে পারলাম একদিন দুপুরবেলা যখন ক্লাসের সবচেয়ে কাঠখোট্টা ছেলে মুশফিক ঘ্যাস ঘ্যাস করে তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আমাদের প্রিয়াংকার জন্যে কিছু একটা করা দরকার!"

আশেপাশে যারা ছিলো তারা সবাই ঘুরে মুশফিকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো, সবাই কখনো না কখনো এই কথাটা ভেবেছে। ক্লাসের সবচেয়ে লাজুক এবং মুখচোরা শিউলি বলল, "হ্যাঁ, আমাদের সবাই মিলে প্রিয়াংকার জন্যে কিছু একটা করা উচিত।"

জয়ন্ত মাথা নাড়ল, বলল, "সবাই মিলে।" সবাই শব্দটাতে সে আলাদা ভাবে জোর দিলো।

আমি একটু অবাক হয়ে দেখলাম আশেপাশে যারা ছিল তারা সবাই কাছাকাছি জড়ো হয়ে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করল। প্রিয়াংকা এর মাঝে কার জন্যে কী করেছে সেটা নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেলো- আমার হয়তো সবচেয়ে বেশি কথা বলা উচিত ছিলো কিন্তু আমি চুপ করে বসে অন্যদের কথা শুনতে লাগলাম। প্রিয়াংকার জন্যে কী করা যায় সে ব্যাপারে ছেলেরা এবং মেয়েরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। মোটাসোটা আদনান বলল প্রিয়াংকাকে নিয়ে আমাদের কোথাও চাইনিজ না হলে পিতজা খেতে যাওয়া উচিত। সব ছেলেরা জোরে জোরে মাথা নেড়ে সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিল। মৌটুসি বলল প্রিয়াংকার জন্যে আমাদের একটা গানের অনুষ্ঠান করা উচিত এবং সব মেয়েরা সেই প্রস্তাবে ছেলেদের থেকেও জোরে জোরে মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। ছেলেদের এবং মেয়েদের মাঝে একটা ঝগড়া শুরু হয়ে যাবার

অবস্থা ঠিক তখন প্রিয়াংকা ক্লাসে হাজির হলো বলে ঝগড়াটা বেশি দূর গড়াতে পারল না।

পরের দিন যখন প্রিয়াংকা আশে-পাশে নেই তখন আবার আগের আলোচনা শুরু হলো– জয়ন্ত চাইনিজ কিংবা গানের অনুষ্ঠান এই দুটো কোনটাতেই না গিয়ে বলল, "আমাদের করা উচিত একটা সারপ্রাইজ পার্টি।"

আদনান ভুরু কুঁচকে বলল, "সারপ্রাইজ পার্টি?"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। সেখানে তোর খাওয়া-দাওয়াও থাকতে পারে আবার ধর গান-বাজনাও থাকতে পারে।"

প্রস্তাবটা অনেকের মনে ধরল। মৌটুসি জিজ্ঞেস করল, "কোথায় হবে সারপ্রাইজ পার্টি?"

মামুন বলল, "এই ক্লাসেই করতে হবে।"

আদনান বলল, "ক্লাসে? ক্লাসে খাওয়া-দাওয়াটা হবে কেমন করে?"

মৌটুসি বলল, "গান-বাজনা করতে হলে হারমোনিয়াম তবলা লাগবে না? ক্লাসে সেটা আনবি কেমন করে?"

আদনান বলল, "আর যদি আনাও হয় সেটা তাহলে সারপ্রাইজ থাকবে না। প্রিয়াংকা বুঝে যাবে।"

শিউলি বলল, "হ্যাঁ। মনে নাই সে একবার আমার জন্মদিনে আমাকে সারপ্রাইজ দিল?"

সেটি সত্যি, সারপ্রাইজ পার্টি দেওয়ার নিয়মকানুন প্রিয়াংকাই সবচেয়ে ভাল জানে! তাকে 'সারপ্রাইজ' করা মনে হয় খুব সোজা না। ক্লাসে তাকে সারপ্রাইজ করতে হলে মনে হয় সে তো 'সারপ্রাইজ' হবেই না, উল্টো আমরা 'সারপ্রাইজ' হয়ে যাব।

আমাদের মাঝে দিলীপ কথাবার্তা কম বলে, সেটা তার বেশি বুদ্ধির লক্ষণ না কম বুদ্ধির লক্ষণ সেটা আমরা এখনো জানি না। পড়াশোনার ব্যাপারে সে যে খুব ঢিলে সেটা আমরা সবাই জানি কিন্তু অন্য বিষয়ে সে কী রকম তার পরীক্ষা কখনো হয় নি। সে হাই তুলে বলল, "আসলে এইটা করতে হবে প্রিয়াংকার বাসায়।"

আমরা সবাই অবাক হয়ে বললাম, "প্রিয়াংকার বাসায়?"

দিলীপ মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

মৌটুসি জানতে চাইল, "সেটা কীভাবে করবি?"

"তা আমি জানি না।" বলে দিলীপ হেঁটে হেঁটে চলে গেলো।

প্রথমে কেউ দিলীপের কথাটা গুরুত্ব দিয়ে নেয় নাই কিন্তু সবাই যখন ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা চিন্তা করলো তখন বুঝতে পারল, সেটাই সবচেয়ে সঠিক

জায়গা। সকালবেলা প্রিয়াংকা যখন বের হয়ে যাবে তখন আমরা সবাই সবকিছু নিয়ে বাসার ভেতরে ঢুকে যাব। সবকিছু চটপট রেডি করে ফেলব তারপর প্রিয়াংকা যখন ফিরে আসবে তখন চিৎকার করে বলব, 'সারপ্রাইজ' সাথে সাথে পার্টি শুরু হয়ে যাবে এবং সেটা হবে একেবারে ফাটাফাটি পার্টি! কিন্তু সমস্যা একটাই, আমরা সবাই মিলে প্রিয়াংকার বাসায় ঢুকবো কেমন করে? সেটা নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে তখন মৌটুসি আমার দিকে তাকালো এবং তাকিয়েই রইলো। আমি বললাম, "আমার দিকে তুই এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন?"

মৌটুসি বলল, "তুই।"

"আমি? আমি কী?"

"তুই ব্যবস্থা করবি।"

"আমি কীসের ব্যবস্থা করব?"

"কেমন করে প্রিয়াংকার বাসায় যাওয়া যায়।"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "আমি কেন?"

"তা না হলে কে? প্রিয়াংকা তোর জন্যে কী করেছে তুই জানিস?"

সত্যি কথা বলতে কী প্রিয়াংকা আমার জন্যে কী করেছে সেটা অন্যেরা কিছুই জানে না। অন্যেরা শুধু জানে গণিত কম্পিটিশনে আমাকে নিয়ে যাবার অংশটুকু! বাকিটুকু শুধু জানি আমি। আমি বললাম, "হ্যাঁ, জানি?"

"তাহলে?" এবারে মৌটুসির সাথে অন্যেরাও যোগ দিলো। জয়ন্ত বলল, "তোর মাঝে কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নাই?" মামুন বলল, "তুই প্রিয়াংকার জন্যে কিছু করতে চাস না?" আদনান বলল, "প্রিয়াংকা তোর জন্যে যেটা করেছে সেটা কী অন্য কেউ করতো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, তা ঠিক আছে, কিন্তু-"

"কোন কিন্তু নাই।" শিউলির মতো মুখচোরা লাজুক মেয়েটা পর্যন্ত হাত তুলে আমাকে ধমক দিয়ে বলল, "তোমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে।"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "কিন্তু-মানে-আমি-ইয়ে-বলছিলাম কী-তাহলে-"

কাজেই কেউ আমার কথা শুনলো না।

আমি কী করব বুঝতে না পেরে পরের দিনই স্কুল ছুটির পর প্রিয়াংকাদের বাসায় হাজির হলাম। প্রিয়াংকা সরাসরি বাসায় যায় না, দুনিয়া ঘুরে নানা জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে আনন্দ বিতরণ করে তারপর বাসায় ফিরে আসে। আমি দরজায়

শব্দ করলাম, কিছুক্ষণ পর খুট করে শব্দ করে প্রিয়াংকার আব্বু দরজা খুলে দিলেন। আমাকে দেখে একটু অবাক হলেন কিন্তু সেটা প্রকাশ করলেন না, বললেন, "আরে আমাদের ম্যাথমেটিশিয়ান দেখি! এসো এসো।"

আমি ভিতরে ঢুকলাম। প্রিয়াংকার আব্বু তার হুইল চেয়ারটি ঘুরিয়ে ঘরের ভেতরে যেতে যেতে বললেন, "বসো তপু। প্রিয়াংকা তো এখনো বাসায় আসে নাই, তার আসতে দেরি হয়–"

"জানি!" আমি ইতস্তত করে বললাম, "আমি আসলে আপনার কাছেই এসেছি।"

"আমার কাছে?"

"জি।"

"কী ব্যাপার?"

"ইয়ে মানে আমি– বলছিলাম কী– এঁ্যা এঁ্যা–" প্রিয়াংকার আব্বু খুব ধৈর্য ধরে মুখে হাসি ফুটিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। আমি শেষ পর্যন্ত বললাম, "আমাদের ক্লাসের সবাই ঠিক করেছে যে প্রিয়াংকার জন্যে একটা সারপ্রাইজ পার্টি দেবে।"

"তাই নাকী! কী উপলক্ষে?"

"কোন উপলক্ষ না। এমনিই।"

"এমনিতেই সারপ্রাইজ পার্টি?"

"জি।"

প্রিয়াংকার আব্বু হেসে বললেন, "তা আমাকে কী করতে হবে?"

"সবাই মিলে ঠিক করেছে পার্টিটা এইখানে হবে।"

"এইখানে?" এবারে প্রিয়াংকার আব্বুর মুখে খুব হালকা মতোন একটু দুশ্চিন্তা উঁকি দিল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তিনি দুশ্চিন্তাটা লুকিয়ে ফেললেন।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "আপনার কিছুই করতে হবে না। সব আমরা করব। আমরা খাবারদাবার নিয়ে আসব। একটা গানের অনুষ্ঠান হবে–"

"গানের অনুষ্ঠান?" মনে হলো আবার তাঁর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়লো। এবারে ঠিক হালকা দুশ্চিন্তার ছাপ নয় বেশ গভীর।

আমি বললাম, "জি। আমাদের ক্লাসের কয়েকজন খুব সুন্দর গান গাইতে পারে। কয়েকজন একটা নাটকও করতে চাইছে।"

"না-নাটক?" এবারে প্রিয়াংকার আব্বুর মুখে আরও বেশি দুশ্চিন্তার ছাপ পড়লো, সেটা ঠিক লুকানোর চেষ্টাও করলেন না। আমতা আমতা করে বললেন, "ইয়ে আমি বলছিলাম কী, সারপ্রাইজ পার্টি সাধারণত সারপ্রাইজ

থাকে না। তার চেয়ে একটা সাধারণ পার্টি করলে ভাল হয় না? খুব সিম্পল। তোমরা সবাই আসলে- আমি আর প্রিয়াংকা মিলে তোমাদের জন্যে একটু চা-নাস্তা রেডি করলাম-"

"উহুঁ।" আমি মাথা নেড়ে বললাম, "ক্লাসের ছেলেমেয়েরা রাজি হবে না।"

প্রিয়াংকার আব্বু চিন্তিত মুখে বললেন, "রাজি হবে না?"

"নাহ!" আমি মুখটা গম্ভীর করে বললাম, "সবাই প্রিয়াংকাকে খুব পছন্দ করে তো- তাই- তার জন্যে একটা সারপ্রাইজ পার্টি দিতে চায়।"

প্রিয়াংকার আব্বু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে! তাহলে তো করতেই হয়।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "জি।"

"আমাকে কী করতে হবে?"

"কিছু করতে হবে না।" আমি ভরসা দিয়ে বললাম, "আমরা সবাই আগেই এসে বাসায় সব কিছু রেডি করে ফেলব। তারপর সবাই লুকিয়ে থাকব। প্রিয়াংকা যেই আসবে-"

প্রিয়াংকার আব্বু মাথা নাড়লেন, বললেন, "বুঝেছি। তোমরা আমাকে আগে জানিয়ে দাও, কবে আসবে, কখন আসবে।"

"জি। জানিয়ে দেব।"

প্রিয়াংকার আব্বুকে একটু মনমরা দেখালো, বললেন, "তোমাকে কী খেতে দেব বলো। ভাল বিস্কুট আছে-"

"না চাচা।" আমি মাথা নেড়ে বললাম, "প্রিয়াংকা এসে আমাকে দেখলে সব বুঝে ফেলবে।"

"তা ঠিক।"

"আমি যাই চাচা।"

"ঠিক আছে।"

"আপনি কিন্তু প্রিয়াংকাকে বলবেন না কিছু।"

"না। বলব না।"

আমি তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বের হয়ে এলাম।

পরের দিন যখন সবাইকে বলেছি যে সারপ্রাইজ পার্টি করার জন্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি তখন সবাই বেশ অবাক হলো। তারা কেউ চিন্তাও করে নাই যে আমি এতো তাড়াতাড়ি প্রিয়াংকার বাসায় গিয়ে তার আব্বুর সাথে কথাবার্তা

বলে সব ঠিক করে ফেলব। প্রথমে তারা বিশ্বাস করতে চাইলো না কয়েকবার কিরা-কসম কাটার পর শেষ পর্যন্ত সবাই বিশ্বাস করল।

কাজেই সবাই মিলে এখন পরের অংশটুকু করার জন্যে রেডি হতে লাগলো। ক্লাস-কবি জহুরুলকে দায়িত্ব দেয়া হলো প্রিয়াংকাকে নিয়ে একটা গান লেখার। গান লেখার পর মৌটুসি আর নীলিমা সেটাতে সুর দিলো। গানটার শুরু এরকম :

আমাদের ক্লাসে আছে ছটফটে মেয়ে
দিন কাটে আনন্দে নেচে গান গেয়ে
প্রিয়াংকা সে যে প্রিয়াংকা...

আদনান, ইশতিয়াক, মামুন, জয়ন্ত তারা মিলে একটা নাটক দাঁড় করাচ্ছে। আমাকেও অভিনয় করতে বলেছিল, আমি রাজি হইনি। আমি ভাল করে কথাই বলতে পারি না, অভিনয় করব কীভাবে? সবার কাছ থেকে চাঁদা তোলা হয়েছে। সেগুলো দিয়ে কিছু উপহার কেনা হবে খাবার-দাবার কেনা হবে। কী খাওয়া হবে সেটা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক করে ঠিক করা হলো কাবাব এবং পরাটা কিনে আনা হবে। তার সাথে পেপসি। যদি টাকা-পয়সা দিয়ে কুলানো যায় তাহলে দুই কেজি মিষ্টিও কিনে আনা হবে। সারপ্রাইজ পার্টি করার জন্যে বাসাটাকে সাজাতে হবে। রঙিন কাগজ এবং বেলুন দিয়ে সাজানোর জন্যে আমাদের ক্লাস শিল্পী নাঈমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো। পুরো ব্যাপারটা করতে হবে ছুটির দিনে, তাই উৎসাহে সবাই ছটফট করতে থাকলেও পরের শুক্রবার দুপুর বেলার আগে সময় ঠিক করা গেলো না। আমি সেটা প্রিয়াংকার আব্বুকে জানানোর জন্যে তাকে ফোন করলাম। ফোন ধরে প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "হ্যালো।"

আমি বললাম, "চাচা, আমি তপু।"

"ও! কী খবর ম্যাথমেটিশিয়ান।"

"জি ভাল। প্রিয়াংকা আশেপাশে নাই তো?"

"না। একটু বাইরে গেছে।"

"চাচা, আমরা শুক্রবার বিকালবেলা টাইম ঠিক করেছি।"

"গুড। আমার কিছু করতে হবে?"

"না চাচা কিছু করতে হবে না। শুধু–"

"শুধু কী?"

"প্রিয়াংকাকে আধা ঘণ্টার জন্যে যদি বাসা থেকে কোথাও পাঠাতে পারেন তাহলে খুব ভাল হয়।"

প্রিয়াংকার আব্বু এক মুহূর্ত কী একটা ভাবলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে, আমি কোন কাজে প্রিয়াংকাকে আধাঘণ্টার জন্যে বাইরে পাঠিয়ে দেব।"

"থ্যাংক ইউ চাচা।"

"কয়টার সময় বাইরে পাঠাব?"

"আড়াইটার সময়।"

"ঠিক আছে। তাহলে আড়াইটা থেকে তিনটার জন্যে তাকে বাইরে পাঠাব। তোমাদের এর মাঝে চলে আসতে হবে।"

"জি চাচা।"

"তাহলে তোমাদের সাথে শুক্রবারে দেখা হবে।"

"জি চাচা। আপনি কিন্তু প্রিয়াংকাকে কিছু বলবেন না।"

প্রিয়াংকার আব্বু হাসলেন, হেসে বললেন, "আমি কিছু বলব না, তবে তোমরা ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিও না। এসব ব্যাপারে প্রিয়াংকা কিন্তু খুব চালাক!"

"জি চাচা। আমরা জানি।"

টেলিফোনটা রেখে আমি বুক থেকে একটা বড় নিঃশ্বাস বের করে দিলাম, আমার ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা আমি অক্ষরে অক্ষরে করে ফেলেছি। এখন অন্যদের বাকি দায়িত্ব শেষ করতে হবে। দেখা যাক কী হয়!

·

সেদিন রাত্রিবেলা যখন মিচকি আমার সাথে দেখা করতে এলো আমি তাকে হাতে তুলে নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "বুঝলি মিচকি, আগামী শুক্রবারে আমাদের বিশাল প্ল্যান।"

মিচকি পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে প্ল্যানটা ভাল করে শুনতে চাইলো। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, "প্রিয়াংকাকে একটা সারপ্রাইজ পার্টি দেব। সারপ্রাইজ পার্টি মানে বুঝেছিস? হঠাৎ করে একটা পার্টি দিয়ে চমকে দেওয়া।"

রান্নাঘর থেকে দুলি খালা হঠাৎ করে স্টোররুমে উঁকি দিল, বলল, "কী ব্যাপার? তুমি একলা একলা কার সাথে কথা বলো?"

আমি তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে মিচকিকে আড়াল করে বললাম, "কার সাথে কথা বলব আবার? নিজের সাথে কথা বলি?"

দুলি খালা দাঁত বের করে হাসলো, বলল, "এই বিষয়টা খারাপ না। নিজের সাথে নিজে কথা বললে কোন ঝগড়া-বিবাদ হয় না। তবে খালি একটা সমস্যা!"

"কী সমস্যা দুলি খালা?"

"অন্যেরা শুনলে তারা পাগল ভাবে!" দুলি খালা হাসতে হাসতে আবার রান্নাঘরে চলে গেলো, আমি শুনলাম, বিড়বিড় করে সে নিজের সাথে কথা বলছে।

আমি মিচকিকে এক টুকরো রুটি ধরিয়ে দিয়ে বললাম, "তাড়াতাড়ি খেয়ে পালিয়ে যা! দুলি খালা দেখলে তোর খবর আছে!"

মিচকি দুই হাতে রুটির টুকরোটা ধরে গভীর মনোযোগ দিয়ে খেতে শুরু করলো।

শুক্রবার দিন দুইটা বাজার আগেই আমি প্রিয়াংকার বাসার কাছাকাছি চলে এসেছি। বাসার ভিতরে এখন ঢোকা যাবে না তাই কাছাকাছি একটা শপিং মলের ভেতরে হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম। একটু পরে পরে বাইরে গিয়ে তার বাসার দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করি প্রিয়াংকাকে তার আব্বু বাসা থেকে বাইরে পাঠিয়েছেন কী না। আড়াইটার বেশ আগেই আমাদের ক্লাসের আরো অনেকেই চলে এসেছে। সবার হাতেই কোন না কোন ধরনের ব্যাগ না হয় প্যাকেট। আমরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রইলাম, একজন শুধু প্রিয়াংকার বাসার দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো।

আড়াইটা বাজার আগেই আমরা দেখলাম প্রিয়াংকা তার বাসা থেকে বের হয়েছে। তার পিঠে একটা ব্যাগ, হাতে একটা কাগজ। কাগজটা পড়ে সেটা ব্যাগে রেখে সে এদিক সেদিক তাকিয়ে রাস্তায় নেমে একটা রিকশা নিলো। রিকশাটা চলে যাবার সাথে সাথেই আমরা চারিদিক থেকে বের হয়ে, প্রায় দৌড়ে প্রিয়াংকার বাসায় চলে এলাম। সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেলো। প্রিয়াংকার আব্বু তার হুইল চেয়ারে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। প্রিয়াংকার আব্বু যে হুইল চেয়ারে থাকেন সেটা আগেই সবাইকে বলে রেখেছিলাম তাই সবাই সেটা স্বাভাবিক ভাবে নিল। প্রিয়াংকার আব্বু আমাদের দেখে বললেন, "তোমরা এসে গেছ তাহলে?"

আমি বললাম, "জি চাচা।"

প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "তোমাদের হাতে আধা ঘণ্টা সময়। আমি প্রিয়াংকাকে পাঠিয়েছি একটা ওষুধ কিনে আনতে ফার্মেসি থেকে, কিন্তু আধা ঘণ্টার মাঝে চলে আসবে।"

জয়ন্ত বলল, "আধা ঘণ্টার মাঝেই সবাই চলে আসবে, আংকেল।"

জয়ন্তের কথা হবার আগেই মৌটুসি আর নীলিমা একটা হারমোনিয়াম আর কিছু পোঁটলাপুটলি নিয়ে ঢুকলো। তাদের পিছু পিছু আরো কয়েকজন। এবং আরো কিছুক্ষণের মাঝে আরো অনেকে। দেখতে দেখতে প্রায় সবাই চলে এসেছে– প্রিয়াংকার আব্বু আমাদের কাজ করতে দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

নাঈমা রঙিন কাগজ কেটে লিখে এনেছে "জয় হোক প্রিয়াংকার" সেটা দেওয়ালে লাগানো হলো। বেলুন ফুলিয়ে ফুলিয়ে ঘরের নানা জায়গায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজিয়ে রাখা হলো। মৌটুসি-নীলিমা আর তার দলবল হারমোনিয়াম নিয়ে রেডি। আদনান, ইশতিয়াক মামুন আর জয়ন্ত তাদের নাটকের জন্যে রেডি। আদনান এবং ইশতিয়াক হবে সন্ত্রাসী, মামুন পুলিশ অফিসার আর জয়ন্ত পথচারী। সন্ত্রাসী আদনান এবং ইশতিয়াকের হাতে অস্ত্র, তাদের চেহারা বিদঘুটে, পুলিশ অফিসার মামুন নকল গোঁফ লাগিয়েছে, পথচারী জয়ন্ত হাবাগোবা সেজে বসে আছে।

শিউলি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, প্রিয়াংকাকে দেখলেই আমাদের সতর্ক করে দেবে। আমরা তখন সবাই দরজার কাছে চলে আসব।

তিনটা বাজার সাথে সাথেই প্রিয়াংকার জন্যে আমরা অপেক্ষা করতে থাকি। আমাদের সাথে প্রিয়াংকার আব্বুও আছেন, মুখে হালকা একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে তার হুইল চেয়ারে বসে আছেন। ঠিক তিনটা দশে প্রিয়াংকাকে রিকশা করে আসতে দেখা গেলো, শিউলি চাপা গলায় বলল, "প্রিয়াংকা আসছে! সবাই রেডি!"

আমরা সবাই তখন দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়ালাম। উত্তেজনায় আমাদের বুক ধুকপুক করছে, শুনতে পাচ্ছি সে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। দরজার সামনে দাঁড়ালো, তারপর দরজায় শব্দ করলো। আদনান টান দিয়ে দরজা খুলে ফেললো আর আমরা সবাই বিকট গলায় চিৎকার করে উঠলাম, "সা-র-প্রা-ই-জ!!"

তারপর যে ঘটনা ঘটলো আমরা তার জন্যে একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না। প্রিয়াংকা ভয়ানক চমকে লাফিয়ে পিছিয়ে সরে যেতে গিয়ে পা বেঁধে পড়ে গেলো। আমরা দেখলাম সে সিঁড়িতে একেবারে মাথা উল্টে পড়ে গেছে, দেওয়ালে জোরে তার মাথা লেগেছে এবং সেভাবে গড়িয়ে পড়ে যেতে যেতে সিঁড়ির নিচে সে আটকে গেলো। একটা হাত তার শরীরের নিচে এমন অস্বাভাবিকভাবে ঢুকে আছে যে দেখলেই বোঝা যায় হাতটা নিশ্চয়ই ভেঙ্গে

গেছে। আমরা বিস্ফারিত চোখে দেখলাম, প্রিয়াংকা নিথর হয়ে পড়ে আছে নড়ছে না। ভয়ে-আতংকে আমার হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ করে যেন থেমে গেলো।

আমি শুনলাম প্রিয়াংকার আব্বু বলছেন, "তোমাদের কেউ একজন আমাকে ধরে একটু নিচে নামিয়ে নিয়ে যাও, প্রিয়াংকার কাছে। প্লিজ।"

হাসপাতালে নেয়ার পর যখন প্রিয়াংকাকে এক্সরে করা হচ্ছে তখন তার জ্ঞান ফিরে এলো। ডান হাতটা কনুইয়ের কাছে ভেঙ্গে গেছে সেটা প্লাস্টার করে দেয়া হলো। যেহেতু মাথায় ব্যথা পেয়েছে সে জন্যে তাকে হাসপাতালে আরো তিনদিন রাখা হলো চোখে চোখে রাখার জন্যে। যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয় তখন আমরা অনেকে সেখানে ছিলাম। প্রিয়াংকার আব্বু যখন প্রিয়াংকাকে নিয়ে অনেক কষ্ট করে ক্যাবে উঠে তার হুইল চেয়ারটা ভাঁজ করে পিছনে রাখছেন তখন আমার দিকে তাকিয়ে কষ্ট করে একটু হেসে বললেন, "বুঝলে ইয়ং ম্যাথমেটিশিয়ান, এ জন্যে আমি সব সময় সারপ্রাইজ পার্টিকে একটু ভয় পাই! সারপ্রাইজটা কোন দিক থেকে আসবে কেউ বুঝতে পারে না!"

প্রিয়াংকার হাতের প্লাস্টার না খোলা পর্যন্ত আমরা সবাই পালা করে তার ক্লাস নোট লিখে দিয়েছি, হোমওয়ার্ক খাতায় তুলে দিয়েছি। স্কুলে টিফিনের সময় যখন দরকার হয়েছে তাকে খাইয়ে দিয়েছি। প্রত্যেক দিন বিকালে তার স্কুলের ব্যাগ ঘাড়ে করে বাসায় পৌঁছে দিয়েছি। ক্লাসের সব ছেলেরা বলল তারা সবাই মিলে এক হাজার বার কান ধরে উঠ বোস করবে, প্রিয়াংকার মনটা নরম করতে এক হাজার বার করতে হয় নাই একশবার করার পরই সে সবাইকে মাফ করে দিয়েছে।

প্রিয়াংকা মাফ করে দিয়েছে সত্যি কিন্তু তার আব্বু আমাদের মাফ করছেন কী না, কিংবা এখন না করলেও পরে কোন দিন মাফ করবেন কী না সেই বিষয়ে আমাদের সবারই খুব সন্দেহ রয়ে গেছে।

ফেরা

আম্মুর কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে আমি জানি না। সত্যি কথা বলতে কী কিছু একটা হয়েছে সেটা আমি কেমন করে জানি সেটাও আমি জানি না, কিন্তু আমি মোটামুটি নিশ্চিত আম্মুর কিছু একটা হয়েছে। অন্ধ মানুষেরা চোখে দেখতে পায় না বলে তারা সবকিছু শব্দ দিয়ে অনুভব করে। আমিও আসলে অন্ধ মানুষের মতো, আমি আম্মুকে দেখি না। আম্মুর সাথে আমার দেখা হয় যখন আম্মু আমাকে মারেন তখন। বাকি সময়টুকু আমি আম্মুকে অনুভব করি শব্দ দিয়ে। আমি স্টোররুমে আমার ছোট বিছানা থেকে আম্মুর প্রত্যেকটা শব্দ শুনতে পাই। আম্মু ঘুম থেকে উঠছেন, বাথরুমে যাচ্ছেন, জানালা খুলে বাইরে তাকাচ্ছেন, গুনগুন করে গান গাইছেন– আম্মুর প্রত্যেকটা শব্দ আমি খুঁটিয়ে খুটিয়ে শুনি। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখে হাসছেন, সিডিতে গান শুনছেন কিংবা খাবার টেবিলে বসে ভাইয়া আর আপুর সাথে গল্প করছেন, সবকিছু শুনে শুনে সেগুলো আমার মাথার মাঝে গেঁথে গেছে। হঠাৎ হঠাৎ যখন আমার সাথে দেখা হয়, এক মুহূর্তে যখন রেগে আগুন হয়ে যান, তখন যখন হিংস্রভাবে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তখনও আমি বুঝতে পারি আম্মু কখন কী করবেন।

অন্ধ মানুষের মতো শুধু শব্দ শুনে শুনে আমি গত তিন বছর আম্মুকে বোঝার চেষ্টা করেছি, তাই যখন স্টোররুমের কোনায় বসে হঠাৎ করে আম্মুর পরিচিত শব্দগুলো শুনতে পাই না তখন বুঝতে পারি আম্মুর কিছু একটা হয়েছে। খাবার টেবিলেও আম্মু আজকাল আগের মতো কথা বলেন না। অনেক সময় নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করেন। মাঝে মাঝে আমার আম্মুকে দেখার ইচ্ছে করে, কিন্তু আমি সাহস পাই না।

সেদিন রাত্রিবেলা আমি মিচকিকে হাতে নিয়ে তার সাথে ফিসফিস করে কথা বলছি— এটা আমার আজকাল অনেকটা অভ্যাসের মতো হয়ে গেছে, সারাদিন কী হয়েছে সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে বলি। আমি জানি শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয় মিচকি আমার সব কথা

বুঝতে পারে! কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমি একটু নিজের অজান্তেই একটু জোরে কথা বলে ফেলেছি। আম্মু কী কারণে রান্নাঘরে এসেছেন আমার গলার স্বর শুনে, নিঃশব্দে স্টোররুমে এসেছেন দেখতে আমি কার সাথে কথা বলছি।

আমি খেয়াল করি নি, হঠাৎ করে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি আম্মু দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার হাতের তালুতে মিচকি বসে ছিল, সেও তখন ঠিক আমার মতো অবাক হয়ে আম্মুর দিকে তাকিয়েছে।

আম্মুর মুখটা ঘেন্নায় বাঁকা হয়ে গেলো, মুখ বিকৃত করে বললেন, "তোর হাতে এটা কী?"

আমি হাতটা নামিয়ে মিচকিকে লুকিয়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। আম্মু চিৎকার করে বললেন, "ইঁদুর? তোর হাতে ইঁদুর?"

আমি মিচকিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সেটাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম কিন্তু বোকা ইঁদুরটা সেটা বুঝলো না, মনে করলো সেটা আরেকটা খেলা, লাফিয়ে আমার হাত বেয়ে কাঁধে উঠে আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইল। আম্মুকে দেখে মনে হলো বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন, আমি জানি এখনই আম্মু চিলের মতো চিৎকার করে উঠবেন, তারপর হাতের কাছে যেটাই পান সেটা নিয়ে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কিন্তু আমি দেখলাম আম্মু কিছুই করলেন না, বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়েই থাকলেন।

আমি এতোটুকু শব্দ না করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইলাম, আম্মুও আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর আমার মনে হতে লাগলো আম্মু আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কিন্তু আমাকে দেখছেন না। আম্মু তখন ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত দিলেন, তার মুখটায় যন্ত্রণায় একটা চিহ্ন ফুটে উঠল, সেইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টলতে টলতে কীভাবে জানি স্টোররুম থেকে বের হয়ে গেলেন। আমি একটু পরে শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম আম্মু ডাইনিং টেবিলে মাথা রেখে চুপচাপ নিঃশব্দে বসে আছেন। আমার খুব ইচ্ছে হলো আম্মুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, "আম্মু তোমার কী হয়েছে?" কিন্তু সাহস হলো না।

রাত্রিবেলা আমি দুলি খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, "দুলি খালা? আম্মুর কী হয়েছে?"

দুলি খালা অবাক হয়ে বলল, "কী হবে? কিছু হয় নাই?"

"তাহলে আম্মু আজকাল এতো কম কথা বলে কেন?"

"তোমার আম্মু কুনোদিনই বেশি কথা বলে নাই–" বলে দুলি খালা পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলো।

সেদিন রাত্রে আমি খুব সাহসের একটা কাজ করলাম, রাত্রিবেলা যখন সবাই নিজের নিজের ঘরে চলে গেছে তখন আমি পা টিপে টিপে আপুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। আপু আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলো, ভুরু কুঁচকে ফিসফিস করে বলল,"তপু?"

"হ্যাঁ, আপু।"

"কী হয়েছে?"

"আপু– আম্মুর কী হয়েছে?"

আপু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো, বলল, "কার?"

"আম্মুর।"

"কী হবে?"

"আম্মু কেমন জানি অন্যরকম ব্যবহার করছেন।"

আপু তখনও আমার কথা বুঝতে পারছিলো না, মাথা নেড়ে বলল, "কীরকম অন্যরকম ব্যবহার করছেন?"

আমি বললাম, "আমি জানি না।"

আপু আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি কী করব বুঝতে না পেরে আমার স্টোররুমে ফিরে এলাম।

আমার সন্দেহটা যে সত্যি সেটা সপ্তাহখানেকের মাঝে সবাই বুঝতে পারলো। আম্মুর অফিসের গাড়ি এসেছে, অফিসে যাবার জন্যে আম্মু বের হবেন, হঠাৎ করে ডাইনিং টেবিলের কাছে এসে হাটু ভেঙ্গে পড়ে গেলেন। টেবিলের কোনায় মাথা লেগে মাথার বেশ খানিকটা কেটে গেলো। আম্মু যদিও উঠে বসে, "আমার কিছু হয় নি, আমার কিছু হয় নি" বলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু অন্যেরা তার কথা শুনলো না। তাকে ধরে একরকম জোর করে হাসপাতালে নিয়ে গেলো। মাথায় ব্যথা পেয়েছেন বলে মাথার এক্সরে করে দেখতে পেলো মাথার ভেতরে একটা বড় টিউমার।

এর পরে সবকিছু কেমন যেন দ্রুত ঘটতে লাগলো। টিউমারটি মোটেও নিরীহ টিউমার না। এটাকে অপারেশন করতে হবে, অপারেশন করলেই যে আম্মু ভাল হয়ে যাবেন কোন ডাক্তার সেটাও দাবি করল না। আম্মু হাসপাতালে আছেন, প্রতিদিন বিকেলে ভাইয়া আর আপুর কাছে আম্মুর খবর শুনতে পাই।

যে সব বিষয়ে আম্মু বিচলিত হন সেগুলো না করার জন্যে ডাক্তারের কড়া নির্দেশ তাই আমার হাসপাতালে যাবার কোন প্রশ্নই আসে না। আমি তাই হাসপাতালে যেতে পারি না, আপু কিংবা ভাইয়া বাসায় এলে তাদের কাছে আম্মুর খবর নিই। খুব দ্রুত আম্মুর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যেতে লাগলো, আমাকে কেউ সেটা বলে দেয় নি কিন্তু আমি জানি আম্মুর মাথায় ভয়ংকর একটা অপারেশন হবে। শুধু অপারেশন হলে হবে না। তারপর কোন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটতে হবে। শুধুমাত্র তাহলেই আম্মুকে বাঁচানো সম্ভব।

আম্মু বাসায় নেই বলে আমাকে স্টোররুমে বসে থাকতে হয় না। আমি মাঝে মাঝে বাসার ভেতরে হাঁটাহাঁটি করি। অনেক দিন পর আমি আম্মুর ঘরে গিয়েছিলাম। ড্রেসিং টেবিলের উপর তার পাউডার, লিপস্টিক পারফিউম সাজানো। চিরুনিতে আম্মুর দুই একটা চুল লেগে আছে। ওয়ারড্রোবের ভেতরে আম্মুর শাড়ি ব্লাউজ। বিছানায় গায়ে দেয়ার কম্বল ভাঁজ করে রাখা আছে, শুধু আম্মু নেই। দেওয়ালে আব্বু আর আম্মুর ছবি, বিয়ের পরপর তোলা, দুজনকেই দেখাচ্ছে খুব কম বয়সী, দুজনে এমনভাবে হাসছেন যে মনে হয় একটু খেয়াল করলে হাসির শব্দ শোনা যাবে।

বসার ঘরে বসে একদিন টেলিভিশন অন করেছি, কতোদিন টেলিভিশন দেখি না বলে জানি না আজকাল টেলিভিশনে কতো রকম নতুন নতুন চ্যানেল বের হয়েছে! কিছু কিছু খুব মজার আর কিছু কিছু এতো উদ্ভট যে মানুষজন কেমন করে দেখে সেটাই আমি চিন্তা করে পাই না। টেলিভিশন না দেখে না দেখে আমার টেলিভিশন দেখার অভ্যাস চলে গেছে তাই কিছুক্ষণ দেখার পরই আমার কেমন জানি বিরক্তি লাগতে থাকে। আমি টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়ে উঠে আসি। বাইরের ঘরে শেলফে অনেক বই। আমি বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখি কিন্তু মনের ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা তাই কোন কিছু আর পড়তে ইচ্ছে করে না।

আম্মুর মাথার অপারেশন হলো দুই সপ্তাহ পরে। তাকে বিদেশে নেয়া হবে কী না সেটা নিয়েও একটু আলোচনা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামা খালারা আপু আর ভাইয়ার সাথে কথা বলে এখানেই অপারেশন করবেন বলে ঠিক করলেন। যেদিন অপারেশন করা হবে সেদিন সকাল থেকে আমি হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। যখন আম্মুকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায় তখন আপু আর ভাইয়া আম্মুর কাছে গিয়ে তার হাত ধরে রইলো। আমি দূরে একটা দরজার

আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম যেন আমাকে দেখতে না পান। হঠাৎ করে দেখে ফেললে কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।

অপারেশনটি শেষ হতে ছয় ঘণ্টা সময় নিলো, যারা অপারেশন করেন তারা টানা ছয় ঘণ্টা বিশ্রাম না করে কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন কে জানে। অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করে আম্মুকে একটা ঘরে নিয়ে রাখা হলো। আম্মুর জ্ঞান নেই বলে আপু আর ভাইয়ার সাথে আমিও দেখতে গেলাম। মাথার মাঝে ব্যান্ডেজ, নাক এবং মুখ থেকে প্ল্যাস্টিকের নল বের হয়ে আসছে। চোখ বন্ধ এবং মুখ অল্প খোলা, নিঃশ্বাসের সাথে সাথে এক ধরনের শব্দ হচ্ছে, কেমন যেন অস্বস্তিকর একটি শব্দ, শুনলে বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে। শরীরের নানা জায়গা থেকে নানারকম তার বের হয়ে এসেছে, চারপাশে অনেক রকম যন্ত্রপাতি, সেগুলোতে অনেক রকম আলো, অনেক রকম শব্দ। আম্মুকে দেখে আমার কাছে একজন অচেনা মানুষ বলে মনে হতে লাগলো। আমাদের সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে দিলো না, একটু পরেই একজন নার্স এসে আমাদের বের করে নিয়ে এলো।

আম্মুর জ্ঞান ফিরবে কী না সেটা নিয়ে সবার ভেতরে সন্দেহ ছিল, কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে আম্মুর জ্ঞান ফিরে এলো। আপু আর ভাইয়া যখন আম্মুর সাথে কথা বলে ফিরে এলো আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আম্মু কেমন আছেন?"

আপু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আগের মতোই।"

"কথা বলেছেন আম্মু?"

"হ্যাঁ। একটু বলেছেন।"

"কী বলেছেন আম্মু?"

আপু হাত নেড়ে উড়িয়ে দেবার মতো করে বলল, "এই তো এটা সেটা।"

আমি অনেক আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমার কথা কিছু বলেছেন আম্মু?"

আপু আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালো, বলল, "না। আম্মু তোর কথা কিছু জিজ্ঞেস করে নাই।"

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে সরে এলাম। আমি একেবারে গোপনে একটা ছেলেমানুষী আশা করে বসেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আম্মুর মাথায় সেই ভয়ংকর টিউমারটির জন্যে আম্মু আমাকে সহ্য করতে পারেন না। সেই টিউমারটি এখন কেটে ফেলে দেয়া হয়েছে এখন হয়তো আম্মু আবার আগের

মতো আমাকে ভালবাসবেন! আপুর কথা শুনে বুঝতে পারলাম সেটি সত্যি নয়। ঠিক কেন জানি না আমার বুকটা ভেঙ্গে গেলো অন্য রকম একটা কষ্টে।

ধীরে ধীর আম্মুর অবস্থা আরো খারাপ হলো। আমি দেখতে পারবো না জেনেও প্রত্যেক দিন এসে ঘরের বইরে বসে থাকতাম। ভাইয়া আর আপু ভেতরে গিয়ে আম্মুর সাথে একটু কথা বলে বের হয়ে আসতো, আমি তাদের কাছে জানতে চাইতাম আম্মু কেমন আছেন। তারা পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারতো না, দায়সারা কিছু একটা বলতো। আমি অপেক্ষা করতাম কখন আম্মু ঘুমাবেন তখন দূর থেকে তাকে গিয়ে দেখে আসতাম, শুধু ভয় করতো হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙ্গে আমাকে দেখে রেগে যান তখন কী হবে? তাকে একবার হাত দিয়ে ছোঁয়ার জন্যে আমার সমস্ত শরীর আকুলি বিকুলি করতো। শুধু মনে হতো একবার যদি আম্মুর বুকের ওপর মাথা রেখে আম্মুর সাথে একটা কথা বলতে পারতাম! সাধারণ একটা কথা। সহজ একটা কথা!

ধীরে ধীরে সবাই বুঝতে পারলো আম্মু আসলে বাঁচবেন না। আম্মু বেশিরভাগ সময় জাগা এবং ঘুমের মাঝামাঝি একটা জায়গায় থাকেন। আজকাল মাঝে মাঝে আপু আর ভাইয়াকেও নাকী চিনতে পারেন না। সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারি না, তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে চাই আম্মু আমার কথা কিছু বলেছেন কী না। কিন্তু কখনোই বলেন না। আমি যে আছি সে কথাটাই যেন ভুলে গেছেন। আর কয়দিন পর আম্মু আর কাউকেই চিনবেন না তখন কী হবে? আম্মুর জীবন থেকে আমি একেবারেই হারিয়ে যাব?

খুব মন খারাপ করে একদিন আমি হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ ডাক্তারদের সাদা গাউন পরা একজন ভদ্রমহিলা আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাকে আমি কোথায় দেখেছি?"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "মনে হয় এইখানে। আমি প্রত্যেক দিন এখানে আসি।"

"উঁহুঁ, এইখানে না। আমি তো এইখানে আগে আসি নাই।" ডাক্তার ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ আমার দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে থাকলেন। হঠাৎ তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন, "মনে পড়েছে! তুমি চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন! গ্রেট ম্যাথমেটিশিয়ান!"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বললেন, "আমি আমার মেয়েকে সেই কম্পিটিশনে নিয়ে গিয়েছিলাম! আমার মেয়ে তোমার অটোগ্রাফ নিয়েছিল।"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে বলল, "ও।"

"তুমি এখানে কেন?"

"আমার আম্মুর মাথায় অপারেশন হয়েছে।"

"কতো নম্বর বেড।"

"সতেরো।"

ভদ্রমহিলা আর কিছু না বলে ভিতরে ঢুকে গেলেন।

আমি একা একা বাইরে বসে আছি তখন দেখতে পেলাম সেই ডাক্তার ভদ্রমহিলা আবার বের হয়ে এসেছেন। আমাকে দেখে আবার আমার কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি কী তোমার মায়ের সাথে কথা বলতে চাও?"

আমি তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না–না।"

ডাক্তার ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন, "কেন না?"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ডাক্তার ভদ্রমহিলা বললেন, "এসো ভেতরে এসো।" একটু থেমে নরম গলায় বললেন, "তোমার আম্মু এই সময়টাতে নিশ্চয়ই তার ছেলেমেয়েকে দেখতে চাইবেন।"

আমি আস্তে আস্তে বললাম, "আমার আম্মুর সামনে যাওয়া নিষেধ। আমাকে দেখলেই আম্মু রেগে যান।"

ডাক্তার ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তোমার আম্মুর আর রেগে ওঠার ক্ষমতাটুকু নেই খোকা!" ভদ্রমহিলা আমার হাত ধরে বললেন, "এসো আমার সাথে।"

ভেতরে পাশাপাশি অনেকগুলো বেড। আম্মুর বেডটা এক কোনায়, ডাক্তার ভদ্রমহিলা আমাকে আম্মুর বেডের কাছে নিয়ে গেলেন। আম্মু চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলেন পায়ের শব্দ শুনে চোখ খুলে তাকালেন। ডাক্তার ভদ্রমহিলা আম্মুকে বললেন, "আপনার ছেলে আপনাকে দেখতে এসেছে।" তারপর আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "তুমি তোমার আম্মুর সাথে কথা বলো। আমি আমার পেশেন্টকে একটু দেখে আসি।"

আম্মু কিছু না বলে আমার দিকে তাকালেন। আমিও আম্মুর দিকে তাকালাম। আব্বু মারা যাবার পর আমি যতবার আম্মুর চোখে দিকে তাকিয়েছি ততবার আম্মুর চোখ ধ্বক করে জ্বলে উঠেছে, এই প্রথমবার আম্মুর চোখ ধ্বক করে জ্বলে উঠল না। আম্মু স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। খুব ধীরে ধীরে আম্মুর চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠলো। আম্মুর ঠোঁট দুটো হঠাৎ নড়ে উঠলো, কিছু একটা বলার চেষ্টা করছেন। আমি আম্মুর কাছাকাছি এগিয়ে গেলাম, শুনলাম আম্মু আমাকে ডাকলেন, "তপু।"

আমি বললাম, "কী আম্মু?"

আম্মু ফিসফিস করে বললেন, "তুই একটু সামনে দাঁড়া। তোকে দেখি।"

আমি আম্মুর সামনে দাঁড়ালাম। আম্মু অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর ফিসফিস করে বললেন, "আমি তোর ওপর অনেক অত্যাচার করেছি। তাই না?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না আম্মু করো নি।"

আম্মু বললেন, "করেছি। আমি জানি।" আম্মু কেমন জানি ক্লান্ত হয়ে গেলেন। মনে হলো কয়েকবার নিঃশ্বাস নিয়ে একটু শক্তি সঞ্চয় করলেন, তারপর বললেন, "তোর আব্বু মারা যাবার পর আমার যে কী হয়ে গেলো আমি জানি না। আমি তোকে সহ্য করতে পারতাম না তপু।'

আমি আম্মুর আরেকটু কাছে এগিয়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে বললাম, "আমি তোমার হাতটা একটু ধরি আম্মু?"

"ধরবি? ধর।"

আমি আস্তে আস্তে আমার আম্মুর হাতটি ধরলাম, আহা! কী শুকনো আর ঠাণ্ডা হাত। হাতটা ধরেই আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। আম্মু স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, ফিসফিস করে বললেন, "আমি তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি তপু। অনেক কষ্ট।"

"না আম্মু দেও নাই।"

"দিয়েছি।"

আমি আম্মুর হাতটা শক্ত করে ধরে রেখে বললাম, "আমি যখন ছোট ছিলাম তখন তুমি আমাকে কতো আদর করতে মনে আছে?"

আম্মু মাথা নাড়লেন। তার মুখে হঠাৎ এক ধরনের হাসি ফুটে উঠল। আহা! কতোদিন পর আমার আম্মু আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমি ফিসফিস করে বললাম, "আমার শুধু সেই আদরের কথা মনে আছে। আর কিছু মনে নাই আম্মু।"

আম্মু কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সত্যি?"

"সত্যি আম্মু।"

আম্মু আমাকে তার দুর্বল হাত দিয়ে টানলেন, বললেন, "আয় বাবা। আমার আরেকটু কাছে আয়।"

আমি আম্মুর আরেকটু কাছে গেলাম। আম্মু আমাকে তার বুকের মাঝে টেনে নিলেন।

আহা! কতো দিন, কতো রাত, কতো যুগ থেকে আমি এই মুহূর্তটার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম! আমি দুই হাত দিয়ে আম্মুকে শক্ত করে ধরে রাখলাম। আমার শুধু মনে হতে লাগলো ছেড়ে দিলেই বুঝি আম্মু চলে যাবেন। খোদা! হেই খোদা - আমার আম্মুকে তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো না। তোমার দোহাই লাগে খোদা!

কিন্তু খোদা আমার কথা শুনলেন না। আমার আম্মু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখে মারা গেলেন।

বাইরে প্রিয়াংকা মৌটুসি শিউলী আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে বের হতে দেখে তারা এগিয়ে এলো। প্রিয়াংকা চোখের পানি মুছে নরম গলায় বলল, "তপু।"

আমি প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করলাম। মা মারা গেলে একজন হাতে কেমন করে সেটা কেউ বুঝতে পারল না। আমি জানি তারা বুঝতে পারবে না। মা মারা গেছেন বলে তো আমি হাসছিলাম না। অনেক দিন পর শেষ পর্যন্ত আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে গিয়েছিলাম বলে হাসছিলাম।

কেউ সেটা বুঝতে পারে নি। শুধু প্রিয়াংকা বুঝতে পেরেছিল। আমি দেখলাম শুধু সে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

চোখে পানি আর ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি - এটি কী বিচিত্র একটি দৃশ্য!